স্টিফান জাইগ

প্রিয়তমেষু

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু

Stefan Zweig-এর

LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN-এর অনুবাদ

অনুবাদক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ

৮৯, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।
ফাল্গুন ১৩৬১

'প্রিয়তমেষু'

একখানি অত্যাশ্চর্য অনুবাদ উপন্যাস। জার্মানীর লেখক স্টিফান জাইগ সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় দেওয়ার অবকাশ নেই। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালি পাঠক ইতিমধ্যেই জাইগের প্রসিদ্ধ রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

'প্রিয়তমেষু' জাইগের সব চেয়ে মর্মস্পর্শী উপন্যাস—Letter from an unknown woman-এর বাংলা রূপ। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ সাবলীল তর্জমা জাইগের লেখাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে, এ কথা পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন।

মাত্র আড়াই টাকা দামে এ বই পাঠকদের হাতে দেওয়া হচ্ছে। অথচ ৩।১, মোহনবাগান লেনস্থ প্রিন্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কত যত্নের সঙ্গে বইটি ছেপেছেন। শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা প্রচ্ছদপট নতুন ভঙ্গীতে ছেপেছেন ফ্যান্সী প্রিন্টিং কোম্পানী। বাঁধাই করেছেন স্বস্তিকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস।

ইতি
প্রকাশক
জ্যোতিপ্রসাদ বসু

পারুল দেবী

সুচরিতাসু

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

* অন্যান্য বই *

নতুন নায়িকা

রাম রহিম

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

অনুবাদ

সেই আশ্চর্য রাত

দুই ভাই

অন্তর্জ্বালা

গোধূলির গান

শাদা কালো

রাজস্রয়

সেতুবন্ধ

বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী'র' দিনকয়েক পাহাড়-অঞ্চলে ছুটি উপভোগ করে ভিয়েনায় ফিরলেন আজ ভোরে। স্টেশনে নেমে তিনি একটা খবর-কাগজ কিনলেন। হঠাৎ কাগজে তারিখটার দিকে চোখ পড়তেই খেয়াল হল—আজ না তাঁর জন্মদিন!

'একচল্লিশ!' বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল বয়েসের কথাটা। কিন্তু, মনেই শুধু পড়ল, খুশি-অখুশি তিনি কিছুই হলেন না। যথারীতি ট্যাক্সি ডাকলেন। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে কাগজে চোখ বুলোতে লাগলেন।

বাড়ি পৌছতে চাকর জানাল, তাঁর অনুপস্থিতে কে কে দেখা করতে এসেছিল। বলল টেলিফোন করেছিল জনাকয়েক। চিঠিপত্রও অনেকগুলি জমে গিয়েছে।

আনমনে চিঠির তাড়ার দিকে তাকিয়ে তিনি দু-একটি চিঠি খুললেন। প্রেরকরা সবাই পরিচিত। তাই কিছুটা কৌতূহল জাগল। একটা চিঠি—
—চিঠি নয় প্যাকেট যেন—বেশ ভারী, ঠিকানায় অচেনা হস্তাক্ষর। আপাতত সেটা একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি গা এলিয়ে দিলেন আরাম-চেয়ারে।

চা খেতে খেতে খবর-কাগজ শেষ করলেন। কয়েকটি সার্কুলারও। তারপর সিগার ধরিয়ে সেই ভারী প্যাকেটটি তুলে নিলেন। খামটা ছিঁড়ে ফেললেন।

চিঠি তো নয়, পাণ্ডুলিপি! তাড়াতাড়িতে লেখা কাগজ এক তাড়া। হাতের লেখাটি আবার মেয়েলি। ছেঁড়া খামটা ফের একবার উল্টেপাল্টে দেখলেন, যদি কোন চিঠিও এর সঙ্গে থেকে থাকে।

কিন্তু না, সে-রকম কিছু নেই। চিঠি নেই, কোন স্বাক্ষরও না। এমন-কি, ভেতরে-বাইরে প্রেরকের ঠিকানাটা পর্যন্ত নেই কোথাও।

'আশ্চর্য কাণ্ড তো!' পাণ্ডুলিপির ওপর চোখ পড়তেই বিস্ময়ে তিনি থমকে গেলেন। সম্বোধনে লেখা রয়েছে—

'তোমাকেই লিখছি, যে-তুমি কোনওদিন আমায় চিনলে না!'

শ্রী'র' বিভ্রান্ত। এ সম্বোধন কি তাঁরই উদ্দেশে, না, কাল্পনিক অন্য কারো? অগাধ কৌতূহল উথলে উঠল বুকের মধ্যে।

তিনি পড়তে লাগলেন—

আমার ছেলে গতকাল মারা গিয়েছে।

ওই ছোট্ট অসহায় প্রাণটিকে বাঁচাবার জন্যে পুরো তিন দিন তিন রাত আমি মৃত্যুর সাথে যুঝেছি। একটানা চল্লিশ ঘণ্টা ওর বিছানার পাশে বসে ছিলাম। জ্বরে ওর সারা গা পুড়ে যাচ্ছিল। বসে বসে আমি শুধু কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি দিয়েছি—সারা দিন সারা রাত! সারা রাত সারা দিন! অসহ্য যন্ত্রণায় ও খালি ছটফট করছিল, কচি কচি ওর হাত দুটি মুঠো করে ধরে আমি বসে ছিলাম। তিন দিন! তিন রাত!

তবু ধরে রাখতে পারলুম না! তৃতীয় সন্ধ্যায় আমার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। কখন-যে চোখের পাতা বুজে এসেছিল, টের পাইনি। টুলের ওপর বসেই ঘুমিয়ে পড়লুম। হয়ত ঘণ্টা তিন-চার ঘুমিয়েছিলুম। আর—

আর এই ফাঁকে এল মৃত্যু, ওকে নিয়ে চলে গেল!

ওই তো, এখনো ও শুয়ে রয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে শুয়ে আছে—ওর ছোট্ট বিছানাটিতে। শুধু আমার খোকনের চোখ দুটি—গভীর

চঞ্চল; ওর চোখ দুটি—শুধু বোজা এখন। বুকের ওপর আড়াআড়ি দুই হাত।

চারটি মোমবাতি জ্বলছে বিছানার চার কোণে।

কিন্তু, ওদিকে আমি তাকাতে পারছিনে। সরে বসবার সামর্থ্যটুকুও নেই। মোমবাতির শিখাগুলি যখন থরথর করে কেঁপে ওঠে, দুলে দুলে কাঁপে —ওর মুখের ওপর, মুদিত ওর ঠোঁটের ওপর শুরু হয়ে যায় ছায়ার ছুটো-ছুটি। মনে হয়, কালো কালো লিকলিকে ছায়ারা যেন এ ওকে তাড়া করে ফিরছে। মনে হয়—

মনে হয়, বাছাও আমার এই বুঝি শিউরে উঠল! বেঁচে উঠল। ও মরে গিয়েছে এ যে আমি ভাবতেও পারিনে! এখুনি হয়ত মাণিক আমার চোখ মেলে চাইবে, উঠে বসবে—কলকণ্ঠে কথা কয়ে উঠবে! ফের মা মা বলে ডাকবে!

হায়! আমি জানি, ও মরে গিয়েছে। আর ও চোখ মেলে চাইবে না! আর কখনো—কোনওদিনও না! বৃথা আশা! কালই সোনা আমার চলে গিয়েছে। জানি!

আজ পৃথিবীতে আমার আপনজন বলতে রয়েছ শুধু তুমি। শুধু তুমি, যে-তুমি আমায় চেননা—কখনো চিনলে না! পৃথিবীকে তুমি কত ভাবেই না ভোগ করছ, মানুষ নিয়ে কত খেলাই খেলছ—আহা, কী বিচিত্র জীবন তোমার! কিন্তু, আমায় তুমি কোনদিন চিনলে না!

অথচ তোমাকেই আমি এতদিন ভালোবেসে এসেছি।

আরেকটি মোমবাতি জ্বালিয়ে এলাম। এটা পঞ্চম।

টেবিলে বসে তোমায় এই চিঠি লিখছি। না লিখে আমার উপায় নেই, তাই। কারো কাছে মনের সব কথা আজ মুখ ফুটে বলতেই হবে,

হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতে হবে—নইলে মৃত সন্তানের শিয়রে একা একা বসে থাকতে তো আমি পারব না। এই দুঃসময়ে, আজকের এই চরম মুহূর্তে, তোমার মত আপন আর কে আমার আছে! আর কে আমার হৃদয়-মন এমন করে জুড়ে রয়েছে, তুমি ছাড়া!

হয়ত, সবকথা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব না। হয়ত, আমায় বুঝতেও তুমি পারবে না। তবু আমায় বলতেই হবে। মাথাটা ভীষণ ধরেছে, কপালের শিরাগুলি টনটন করছে, সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা! জ্বর-জ্বর লাগছে। জ্বর হওয়াও কিছু আশ্চর্য না। এদিকে যেভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বাড়ছে, কে জানে, আমাকেও শেষে ধরল কিনা! একেকবার চোখের সামনে সবকিছু আঁধার হয়ে আসে। হয়ত, এই চিঠি শেষ করে যেতে পারব না। তবু চেষ্টা করব, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে একবার—এই একটিবার শুধু—চেষ্টা করব তোমাকে সব খুলে বলতে।

তোমাকে—যে-তুমি আমায় কখনও চিনলে না!

ওগো, শুধু তোমাকেই আজ আমি বলতে চাই—আমার কাহিনী। আজ, এই প্রথম, আমার জীবনের সব-কিছু তোমায় খুলে বলব। আমার সারাটা জীবন আজ তোমার সামনে মেলে ধরব। এ-জীবন তোমারই পায়ে সঁপে-দেওয়া। অথচ এর কিছুই তুমি জানতে না এতকাল!

আজ জানবে। কিন্তু, জানবে যখন, আমি আর এ-জগতে নেই। কারো কাছে তখন তোমায় জবাবদিহি করতে হবে না। যে-আশঙ্কা করছি যদি তা সত্য হয়, সত্যিই যদি কাল রোগে আমায় ধরে থাকে—তবেই তুমি সব জানতে পারবে। নইলে—

নইলে নয়। যদি বেঁচে থাকি, এ-চিঠি আমি কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে

ফেলব। এতকাল যা গোপন রেখেছি, মরবার দিনটি পর্যন্ত তা গোপন রাখব। আর—

আর যদি এ-চিঠি তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছোয়, তাহলে মনে কোরো—মরে-যাওয়া একটি মেয়ের জীবনকাহিনী পড়ছ। তার জীবনের শুরু থেকে শেষ সচেতন মুহূর্তটি পর্যন্ত ছিল তোমার। ওগো, আমার চিঠি পড়ে ভয় পেওনা কিন্তু। জান তো, মরা মানুষের কোন সাধই থাকে না—প্রেম না, সহানুভূতি না, সান্ত্বনাও নয়? শুধু এই মিনতি, আমার কথাগুলি বিশ্বাস কোরো। কী গভীর বেদনায়, কত দুঃখে-যে সব কথা আজ নিজ মুখে বলতে হচ্ছে! ওগো, দোহাই তোমার, বিশ্বাস কোরো আমার কথাগুলি। আর কিছুই আমি চাইনে। আর কোন কামনা, কোনও প্রার্থনা আমার নেই। একমাত্র সন্তানের মৃতদেহের পাশে বসে মা কখনো মিছে কথা বলেনা—এইটুকু শুধু মনে রেখ।

আমার সারাজীবনের কথা আজ তোমায় বলব। বলতে-কি, এ-জীবনের সূচনা তোমাকে দেখার—প্রথম তোমাকে দেখার সেই শুভ লগ্নটি থেকে। তার আগেকার কথা যতদূর মনে পড়ে, তখন যেন চোরকুঠরীর বাসিন্দা ছিলাম। ধুলো আর ধোঁয়া—নোংরা মানুষ আর জঘন্য পরিবেশ। মনপ্রাণ দিয়ে সে-জীবনকে আমি গ্রহণ করতে পারিনি। দমবন্ধ সেই আবহাওয়ায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। ঝাপসা ঝাপসা সেই-সব স্মৃতি মনে পড়ে। মনে পড়ে আর মন ভরে যায় বিষণ্ণতায়।

তুমি যখন আমার জীবনে এলে, আমার বয়েস তেরো। আজ তুমি যে-বাড়িতে থাক, আমিও তখন ওখানে ছিলুম। হ্যাঁ গো, ও-ই বাড়িতে, যেখানে বসে এই চিঠি—আমার অন্তিম আকুতিতে ভরা, আমার চোখের জলে ভেজা এই চিঠিখানা—তুমি পড়ছ। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে আমরা

থাকতুম। আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনেই ছিল তোমার ফ্ল্যাটের দরজা—একেবারে মুখোমুখি।

হয়ত আমাদের কথা তুমি একেবারে ভুলে গিয়েছ। হয়ত কেন, নিশ্চয়। শোকের পোশাক পরা সেই একাউন্টেন্টের বিধবা আর কৃশ এক কিশোরীর মুখ তোমার মন থেকে এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে। যাওয়াই স্বাভাবিক। কোনমতে ভদ্রতা বজায় রেখে, কোনওরকম হই-চই না করে, আমরা দিন কাটাতুম। হয়ত আমার নামও তুমি শোননি। কি করেই বা শুনবে! আমাদের দরজায় তো নেমপ্লেট ছিলনা, আমাদের সাথে তো দেখসাক্ষাৎ করতেও কেউ আসত না। তাছাড়া, সে কী আজকের কথা! কম করেও বছর পনের-ষোল হল। এতদিনের কথা তোমার মনে পড়া শক্ত বৈকি।

কিন্তু আমার! সবকিছুর খুঁটিনাটি এখনো আমার মনে রয়েছে—হুবহু। এ যেন এই কিছুক্ষণ আগের ঘটনা, চোখের সামনে এখনো জ্বলজ্বল করছে—সেই দিনটির কথা, সেই বিশেষ মুহূর্তটির কথা—যখন প্রথম তোমার স্বর আমার কানে এল, প্রথম যখন দেখলুম তোমায়। সেই তো আমার জীবনের শুরু, আমার জীবনে সূর্যোদয়।

ধৈর্য ধরো, ওগো, একটুখন ধৈর্য ধরে থাকো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু আজ তোমায় বলে যাব। ওগো, সারা জীবন আমি তোমায় ভালোবেসে এসেছি, মুহূর্তের জন্যেও তোমার থেকে মুখ ফেরাইনি—আর এইতো ক'পাতা চিঠি, তোমার পায়ে পড়ি, অধীর হোয়ো না।

তুমি আসার আগে ওই ফ্ল্যাটে যারা থাকত তারা ছিল ভারী বদ। চব্বিশ ঘণ্টা তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকত। নিজেরা ভীষণ গরীব, তবু তারা ঘৃণা করত আমাদের। কেন জানো?—আমরা গরীব বলে, তাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আমরা চলতুম বলে। কর্তাটি

আবার পাঁড় মাতাল, বউটাকে যখন-তখন মারধোর করত। অনেক সময় মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গিয়েছে—রাত্রির স্তব্ধতা খানখান হচ্ছে বাসনপত্র চেয়ার-টেবিল আছড়ানোর শব্দে—দুরু দুরু বুকে শুনতুম।

একদিন তো লোকটা বউকে মারতে মারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল। সে বেচারী ফ্ল্যাট থেকে আলুথালু বেশে পালিয়ে এল, মাতাল স্বামী পিছনে, মুখে তার অনর্গল খিস্তি। গোলমাল শুনে বাকি লোকজন এসে জুটল। সিঁড়ির গোড়ায় কী ভিড়! শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভয় দেখিয়ে লোকটাকে থামাল সবাই।

মা এদের এড়িয়ে চলতেন। আমাকেও ওদের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে মানা করে দিয়েছিলেন। তাই তারা আমায় দেখলেই ভেংচি কাটত, টিটকিরি দিত। রাস্তায় দেখা হলে যা-তা বলত। একবার বরফের ঢেলা দিয়ে এমন জোরে আমায় মেরেছিল না, যে আমার কপালের অনেকখানি কেটে গিয়েছিল।

বাড়ির কেউই ওদের দেখতে পারত না।

তারপর, কী-যেন হল, বোধ হয় চুরির দায়ে লোকটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে, বউটি ছেলেপিলে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

ওদের দরজার সামনে দিন কয়েক 'বাড়ি ভাড়া'র নোটিশ টাঙানো রইল। একদিন দেখলুম সেটা আর নেই। দরোয়ান বলল, কে-এক সাহিত্যিক ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছেন। ভদ্রলোক অবিবাহিত এবং শান্তিপ্রিয়।

সেই প্রথম তোমার নাম আমি শুনলুম।

কেটে গেল কিছু দিন। এর মধ্যে ফ্ল্যাটটাকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হল। চুনকাম করার জন্যে জন-মিস্ত্রী এল, লোক এল ঘর সাজাবার আসবাব-পত্র নিয়ে। তারা এসে অবিশ্যি খুবই হই-চই শুরু করে

দিয়েছিল, কিন্তু মা আমার এতে খুশিই হলেন। বললেন, যাক, এতদিন ঘরের পাশের উৎপাত বন্ধ হবে।

তোমায় কিন্তু আমি তখনো দেখিনি। তোমার চাকরই এই চুনকাম আর ঘরদোর সাজানোর ব্যাপারে তদারক করছিল। লোকটি দেখতে ছোট্টখাট্ট, চেহারা ভারিক্কি, মাথার চুলগুলি সব শাদা হয়ে গিয়েছে। চালচলনে বেশ একটা বনেদীয়ানার ছাপ আছে। বেশ ধীরে-সুস্থে সমস্ত কাজকর্মের সে দেখাশোনা করত। আমাদের সকলেরই তাকে খুব ভালো লেগেছিল। কেনই বা লাগবে না বলো—আমরা থাকতুম শহরতলীর ভাড়াটে এক ফ্ল্যাট-বাড়িতে, সেখানে এ-ধরনের অভিজাত চাকরের দেখা তো কোনদিন পাইনি। তাছাড়া মানুষ হিসেবেও সে ছিল বড় ভদ্র।

চাকর বটে তাই বলে কিন্তু সাধারণ চাকর-বাকরদের সাথে গলায় গলায় কখনো ভাব জমায়নি। প্রথম থেকেই আমার মাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে, ভদ্রমহিলার মত ব্যবহার করত মার সাথে। এমন-কি আমি যে একরত্তি এক মেয়ে, আমাকেও রীতিমত সমীহ করে চলত। তোমার কথা উঠলে এমন ভাবে কথা কইত যেন সেই তোমার অভিভাবক। এই সব কারণে বুড়ো জনকে আমি বড় ভালোবাসতুম। অবিশ্যি, হিংসেও করতুম। করব না—সব সময় ও কেমন তোমার পাশটিতে থাকতে পারে, তোমার সেবার সৌভাগ্য লাভ করে!

এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা কেন বলছি, জানো? তখনো ভীরু লাজুক ছোট্ট এক কিশোরী আমি, মুখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারিনে—তবু, তখনই, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমার ওপর পড়েছিল, প্রথম থেকেই আমায় একেবারে অভিভূত করে রেখেছিল। চর্মচক্ষে দেখার আগেই মনশ্চক্ষে দেখেছি তোমায়। আর, স্বপ্নের জাল বুনেছি, মনে মনে, তোমায় ঘিরে: অতুল ঐশ্বর্য তোমার, বিচিত্র জীবন, কতনা

রহস্যের আলোছায়ার আল্পনা সে-জীবনে—তোমার সাথে এ-জগতে তুলনা কার!

যারা সংকীর্ণ ভাবে জীবন কাটায়, দিনগত পাপক্ষয় করে চলে—রোমাঞ্চকর নতুনের স্বাদ তারা কখনো পায় না। আমরাও পাইনি। তাই শহর-তলীর ছোট্ট ওই ফ্ল্যাটবাড়িটিতে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আমরা অমন অধীর হয়ে উঠেছিলুম। এতো আগমন নয়, আবির্ভাব!

আমার নিজের কথা? যেদিন বিকেলবেলা ইস্কুল থেকে ফিরে দেখলুম আমাদের বাড়ির সামনে একটি মাল বোঝাই লরী দাঁড়িয়ে, অসহ্য কৌতূহলে বুক আমার থরথর করে উঠল। বড় বড় আসবাবগুলি তখন নামানো হয়ে গিয়েছে। ছোটখাটগুলো নামানো হচ্ছে। কুলিরা মহা ব্যস্ত।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, মুগ্ধ চোখে। প্রত্যেকটি জিনিসই তোমার অভিনব, এতদিন যা দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত তার সাথে এসবের কোন মিল নেই। ভারতীয় দেবদেবীর মনোরম মূর্তি, নয়নমনোহর ইতালীয় ভাস্কর্য, উজ্জ্বলরঙ বড় বড় ছবি। আর বই! ঈশ্, কত্ত বই! কী সুন্দর সুন্দর বই সব! বই-যে এত সুন্দর হতে পারে এ কি কক্ষনো ভাবতে পেরেছি! স্বপ্নেও কল্পনা করেছি! বইগুলি নামিয়ে এনে দরজার সামনে জড়ো করা হচ্ছে। তোমার চাকরটি সযত্নে ঝাড়ন দিয়ে একটি-একটি করে ঝেড়ে-মুছে রাখছে। আবার নতুন নতুন বই এসে জড়ো হল। এমনি বারবার।

দূর থেকে দেখে যেন আশ মেটে না—লোভীর মত গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলুম।

ইচ্ছে হল, হাত দিয়ে বইগুলি একবার ছুঁয়ে দেখি। কী চমৎকার চামড়ার বাঁধাই! হাত দিতে কিন্তু সাহস হল না। না, তোমার চাকর অবিশ্যি

মানা করেনি, তবে তার চোখে-মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসাও বড় পেলুম না। দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে কয়েকটি বইয়ের নাম পড়বার চেষ্টা করলুম। বেশির ভাগই ফরাসি আর ইংরেজি বই। বা এমন কোন ভাষায়, যার একবর্ণও আমি বুঝিনে। তা, না বুঝি তাতে কি, সাধ হল এই ভাবে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক বইয়ের দিকে চোখ রেখে। এও কী কম সৌভাগ্য? কী ভালই-যে লাগছিল!

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হল না, ভেতর থেকে মা ডাক দিলেন। চলে যেতে হল বাধ্য হয়ে।

তখনো তোমায় চোখে দেখিনি, তবু তোমার কথাই বারবার খালি মনে পড়ছিল। সারাটা সন্ধ্যে তোমায় ভেবে কাটিয়ে দিলুম। নিজের বলতে আমার ছিল খানকয়েক সস্তা দরের বই, বাজে বোর্ড দিয়ে বাঁধাই। তবু পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতুম আমি এই বইগুলিকে। একবার, দুবার—বারবার পড়তুম, তবু যেন পুরনো হত না, ফুরিয়ে যেত না। তোমার কথা ভেবে এখন বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। এ্যাতো বই আছে ওঁর, এ্যাতো পড়াশোনা উনি করেন! ঈশ! কত ভাষাই না জানেন। বড়লোক নিশ্চয়। বড়লোক, আবার পণ্ডিতও। বইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে বইয়ের মালিকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় হৃদয় আমার ভরে উঠল।

মনে মনে তোমার চেহারাটা কল্পনা করলুম: থুত্থুরে বুড়ো, নাকের ডগায় চশমা, বুকভরা শাদা দাড়ি—অবিকল আমাদের ভূগোলের মাস্টার মশাইয়ের মত। ভূগোলের মাস্টার মশাই? উঁহু, ঠিক তাঁর মত নয়—তাঁর চেয়ে তুমি সহৃদয়, তাঁর চেয়েও সুন্দর। এবং ভদ্র। তুমি যে বুড়ো থুত্থুরে তাতে আমার কোন সন্দেহ তখন ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে কেন যেন মনে হয়েছিল অত্যন্ত সুপুরুষ তুমি।

সেই রাতে তোমার স্বপ্ন দেখলুম। স্বপ্নে প্রথম দেখলুম তোমায়!

তুমি এলে পরের দিন।

সারাদিন হা-পিত্যেশ করে থাকলেও ঠিক কখন-যে তুমি বাড়িতে ঢুকলে টের পাইনি। তোমায় দেখা হল না। তাই কৌতূহল গেল আরো বেড়ে, যাকে বলে একেবারে উদগ্র হয়ে উঠল।

তোমায় দেখলুম তৃতীয় দিনের দিন।

কিন্তু, দ্যাখ দেখি অবাক কাণ্ড, আমার কিশোরী কল্পনার সাথে এতটুকু মিল নেই গা! এযে দেখি একেবারে আলাদা মানুষ। শিশুমনে চিরন্তন ভগবানের যে মূর্তি খোদাই করা থাকে, শ্রদ্ধা আর ভক্তি মিশিয়ে তাকেই আমি জীয়ন্ত করে তুলেছিলুম: চোখে চশমা, স্মিতহাসি, হৃদয়বান এক বৃদ্ধ! আর তুমি! মুখে তোমার বয়েসের বলিরেখা পড়েনি, পরনে তোমার ফিকে-ব্রাউন স্যুট, ছেলেমানুষের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছ সিঁড়ি দিয়ে, এক-এক লাফে দুটি করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে যাচ্ছ—চালচলনে শিশুয়ালি অস্থিরতা। টুপিটি হাতে, তাই বুদ্ধিদীপ্ত তোমার সুন্দর সুকুমার মুখ আর পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল স্পষ্ট চোখে পড়ল, চোখ ফেরাতে পারলুম না। তোমার সুগঠিত ছিপছিপে চেহারার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলুম, তাকিয়ে রইলুম নিশ্বাস চেপে, বুকের কাঁপন রোধ করে।

আশ্চর্য কি জানো, আর-আর সকলের মত প্রথম দর্শনেই আমারো মনে হয়েছিল: তুমি একটি বিস্ময়। মনে হয়েছিল: তোমার যেন দুটি সত্তা, দুই রূপ তোমার। একজন চটুল-চতুর তরুণ, হাসি-গান-হল্লায় যে ডুবে রয়েছে, জীবনকে যে পুরোপুরি উপভোগ করে নিতে চায়।

জীবনরসিক। আরেক জন শিল্পরসিক। বিদগ্ধমন, মার্জিতরুচি। প্রচুর তার পড়াশোনা, অগাধ পাণ্ডিত্য। সেখানে সে গভীর, গম্ভীর; স্থিতধী, দায়িত্ববোধসম্পন্ন। বিপরীত দুটি ধারা এসে মিশেছে তোমার মধ্যে, একই মানুষের দ্বৈতপ্রকাশ—অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী। তোমার জীবনে আর যারা-যারা এসেছে তাদের মত আমিও এটা বুঝতে পেরেছিলুম, পেরেছিলুম নিজেরই অজান্তে। তোমার এক রূপের সাথে সকলেরই পরিচয় রয়েছে, সারা পৃথিবীর লোক জানে সেকথা। কিন্তু আরেকটি রূপকে তুমি সবার চোখ থেকে আড়াল করে রেখেছ। শুধু তুমি—একমাত্র তুমিই শুধু—তার মুখোমুখি হও।

তখন আমার বয়েস সবে তেরো। নগণ্য এক কিশোরী আমি। তবু প্রথম দর্শনেই তোমার এই দ্বৈতরূপ আমার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। কেন পড়বে না বলো, সেদিনও কি তোমায় আলাদা করে ভাবতে পেরেছি, নিজেকে বাদ দিয়ে? প্রথম থেকেই আমি যে তোমার মোহমুগ্ধ।

আমার কিশোরমনে সেদিন কী যাদুকরী প্রভাব তুমি বিস্তার করেছিলে, আজ তা কল্পনাও করতে পারবেনা। আমার মনের আকাশে রামধনুর ছটা লেগেছিল, চোখের সামনে রূপে রসে গন্ধে বর্ণে ভরা বিচিত্র এক জীবনের দ্বার খুলে গিয়েছিল। ভাবতে পারো, এর নায়ক কে?

এমন একজন মানুষ এখানে এসেছে, সবাই যার সাথে সসম্ভ্রমে কথা বলে। বলবে না, পৃথিবী জুড়ে খ্যাতি যে তার! কিন্তু কী আশ্চর্য ছাখো, আমার চোখে ধরা পড়ে গেল তার আরেক রূপ। বছর পঁচিশেকের বেপরোয়া এক তরুণ। প্রাণচঞ্চল যৌবনের মূর্ত প্রতীক।

বুঝতেই পারছ, এর পর থেকে তুমিই আমার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠলে, আমার স্বপ্নকামনা তোমায় ঘিরে মুঞ্জরিত হতে লাগল। তেরো বছরের ছোট্ট মেয়ে, প্রেমের সে কীইবা বোঝে, কতটুকুই বা জানে, তবু তার

প্রিয়তম হলে তুমি। আমার সমস্ত মনপ্রাণ তোমার দিকে চলে গেল। নিজেকে সঁপে দিলুম নিঃশেষে।

তোমায় লক্ষ্য করতুম। তোমার চলাফেরা, তোমার প্রতিটি কাজকর্ম আচারআচরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতুম। শুধু কি তোমার? তোমার ভক্তদের সম্পর্কেও কৌতূহলের শেষ ছিল না। সেখানে দেখতুম তোমার দ্বৈতরূপের প্রকাশ। তাই, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ কমা দূরে থাক, দিনকে-দিন বেড়েই চলল।

নানা রকম লোক আসত তোমার কাছে। কেউ নেহাৎ ছেলেমানুষ, কেউ-বা তোমার সমবয়েসী। ভক্ত এবং বন্ধু তারা। ছাত্ররাও আসত, সাজেপোশাকে অযত্নের ছাপ ফুটিয়ে। তাদের সাথে তুমি হাসিঠাট্টা করতে, কান খাড়া করে শুনতুম। মোটরে করে ভদ্রমহিলারাও আসতেন। একবার এলেন এক অপেরার পরিচালক। ভদ্রলোককে একদিন দূর হতে আমি দেখেছিলুম, ভাবতেও পারিনি যে আমাদের বাড়িতে কোনদিন তাঁর পায়ের ধুলো পড়তে। তরুণীরা আসত।

আসত ইস্কুলের ছাত্রীরাও। তারা এসে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার পাট ধরে, লজ্জায় জড়সড় হয়ে।

দর্শনার্থীদের বেশির ভাগই ছিল মেয়ে। তবে তা নিয়ে আমি কিন্তু মাথা ঘামাতুম না। কী দরকার! এমন-কি, একদিন সকালে ইস্কুলে যাবার সময় যখন দেখলুম—ওড়নায় মুখ ঢেকে একটি মেয়ে তোমার ফ্ল্যাট থেকে তরতর করে নেমে আসছে, তখনো আমার মনে কোন ঈর্ষা জাগেনি—বিশ্বাস করো।

ঈর্ষা কেন জাগবে, বলো? মাত্র তেরো বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে আমি, কি করে জানব যে তোমার প্রতি এই-যে আমার দুরন্ত কৌতূহল, এই যে বুক-দুরুদুরু আকুলতা,—এরই নাম প্রেম! একেই বলে ভালোবাসা!

কিন্তু কবে, কোন মুহূর্তে, আমার হৃদয়কে তোমার পায়ে ডালি দিয়েছিলুম—স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে—আজো তা স্পষ্ট মনে রয়েছে।

ইস্কুলের এক সহপাঠিনীর সাথে বেড়িয়ে ফিরেছি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে গল্প করছি—এমন সময় একটি মোটর এসে থামল। লাফ দিয়ে তুমি নামলে। চঞ্চল পায়ে এগিয়ে এলে। এই-ই তোমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—চলাফেরায় যৌবনের এই অস্থির প্রকাশ। তোমার এই রূপ, মনে পড়লে, এখনো আমায় মাতাল করে তোলে। —যাক, ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলে, হঠাৎ কি মনে হল, দরজাটা খুলের দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি এগিয়ে গেলুম। তুমিও একেবারে গায়ের উপর এসে পড়লে, ধাক্কাধাক্কি হয় আর-কি! থমকে দাঁড়ালে, মুখ তুলে তাকালে—আমার সমস্ত দেহের উপর বারেক সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তোমার সে-চাউনি আমার সর্বাঙ্গে যেন সোহাগ-পরশ ছড়িয়ে দিল, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তোমার ঠোঁটের কোণে। আস্তে আস্তে মধুর স্বরে, কানে কানে যেন গোপন সুরে, বললে, 'অনেক—অনেক ধন্যবাদ!'

আর একটি কথাও নয়। কিন্তু যে-মুহূর্তে তুমি সস্নেহ দৃষ্টিতে, অনুরাগ-ঝরা চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলে, সেই মুহূর্তে আমি তোমার হয়ে গিয়েছিলুম। আমার ইহকাল, আমার পরকাল, আমার জন্মজন্মান্তর তোমার হাতে সঁপে দিয়েছিলুম।

পরে, খুব পরে অবিশ্যি নয়, বুঝেছিলুম, এটাই তোমার স্বভাব। শুধু আমি কেন, যে-কোন মেয়ের সংস্পর্শে এলে তার দিকে তুমি এই একই স্নেহাতুর চোখে তাকাও। দৃষ্টিতে তোমার সোহাগ পরশ, স্পর্শে তোমার দহনজ্বালা—একদিকে তা বাস্তব পৃথিবীর অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে

নেয়। ওগো, জাত মন-ভোলানিয়া তুমি। সব মেয়েই সমান তোমার কাছে। দোকানের পরিচারিকা কি বাড়ির ঝি—যেই হোক—মেয়েদের দিকে তাকালেই তোমার চোখে তীব্র এক আলোর রোশনাই জ্বলে ওঠে। না গো না, আমি বলছিনে যে সব মেয়েকেই তুমি উপভোগ করতে চাও। কিন্তু তোমার যৌনকামনার শিখা—তুমি জানতেও পারো না—তোমার চোখের তারায় তারায় ঝিলিক দিতে থাকে। তাই তো কোন মেয়ের দিকে, শুধু মেয়েদের দিকেই, দৃষ্টি পড়ামাত্র তোমার চোখের চাউনি বদলে যায়।

তেরো বছরের মেয়ের এতসব কথা ভাববার নয়, ভাবিও নি। তুমি চলে গেলে, আগুনের পরশমণি প্রাণে আমার ছুঁইয়ে গেলে—মনে হল, তোমার এই স্নেহ আর সোহাগের উছল ধারা নেমে এসেছিল আমার জন্যে, আমারি জন্যে। তেরো বছরের ছোট্ট মেয়েটির মধ্যে জেগে উঠল পরিপূর্ণ এক নারী। হ্যাঁ, তুমিই জাগালে। আর, সে-নারী তোমার, চিরদিনের মত তোমার হয়ে গেল।

'কে রে?' বান্ধবী খোঁচা দিল।

প্রথমে কোন জবাব দিতে পারলুম না। মুখ ফুটে তোমার নাম উচ্চারণও যেন অসম্ভব। মনে হল, এ-নাম আমার অতি পবিত্র, এ-নাম আমার গোপন আদরের ধন। সবার সামনে কী উচ্চারণ এটা করা যায়।

থতমত খেয়ে বললুম, 'উনি? এই, মানে, আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন আর কি।'

'অ! বুঝেছি।' বান্ধবী মুচকে হাসল। 'তাহলে উনি তোর দিকে তাকাতে অত লজ্জা পেলি কেন? কেন অমন লাল হয়ে উঠেছিলি?' কৌতূহলী শিশুর উগ্র ঈর্ষা বান্ধবীর স্বরে।

ও আমায় ঠাট্টা করছে, বেশ বুঝছি। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার গোপন রহস্য জেনে নেবার মতলব। টের পাওয়া মাত্র আমি হয়ে গেলুম আরো বেশি নার্ভাস। দুই কান আমার ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

ধমক দিয়ে বললুম, 'ধেৎ, অসভ্য কোথাকার! যা-তা বলবিনে বলছি।' ভীষণ রাগ হয়ে গেল। ইচ্ছে হল, মুখপুড়িটার গলা টিপে ধরি।

আমার দিকে তাকিয়ে ও মিটি মিটি হাসছে। গা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু, আর কি বলব আমি? আর কী আমি বলতে পারি? হঠাৎ দুই চোখ ঝাপসা হয়ে এল। দরজার কাছে ওকে ফেলে রেখেই দৌড়ে উপরে চলে গেলাম।

সেদিন, সেইদিন থেকে তোমায় আমি ভালোবাসতে শুরু করেছি।

মেয়েদের কাছ থেকে ভালোবাসার কথা শোনায় তুমি অভ্যস্ত, জানি! কিন্তু এ-ও জানি যে আমার মত এত ভালো তোমায় কেউ বাসেনি। অন্ধের মত তোমায় আমি ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি দাসীবাঁদীর মত, প্রভুভক্ত কুকুরের মত। আমার মত শ্রদ্ধা ভক্তি কেউ তোমায় করেনা, কে-উ না। কিশোরীর ভালোবাসার সাথে জগতে আর কিসের তুলনা!

এ প্রেম একান্ত অসহায়, এ প্রেম নিতান্ত অনুগত। এ প্রেমে ধৈর্যের পরীক্ষা, এ প্রেমে বাসনার অন্তর্জ্বালা। কামনালোলুপ নারীর প্রেম এ নয়। মনের অগোচরে জন্ম এই প্রেমের—হৃদয়ের গভীরে।

কিশোরীর নিরালা জীবনে বিকশিত হয় প্রেমের শতদল। শুধুই কিশোরীর। বয়স্কা নারীর প্রেম প্রিয়তমের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে, গোপন বিশ্রম্ভালাপের অন্তরঙ্গতায় সার্থক হয়ে ওঠে। প্রেমের কথা তারা অনেক শুনেছে, অনেক পড়েছে প্রেমের কাহিনী—তারা জানে কোন-এক দিন প্রেমের আবির্ভাব সকলের জীবনেই হয়। প্রেম নিয়ে

তারা পুতুল খেলে, মন নিয়ে করে ছিনিমিনি। ছোটবেলায় সিগারেট খেতে শেখার সময় ছেলেরা যেমন সিগারেটটি নিয়ে বারবার নেড়ে-চেড়ে দেখে, প্রেম নিয়েও এরা করে অবিকল তাই।

আমি ব্যতিক্রম। এমন কোন প্রাণের সখী আমার ছিল না, সব কথা যাকে খুলে বলতে পারি। পরামর্শ নেবার মত একটা মানুষ নেই, সাবধান করে দেবারও কেউ না। অবুঝ অনভিজ্ঞা কিশোরী আমি, সকলের সকল সন্দেহের অতীত। অন্ধের মত ভাগ্যের হাতে নিজেকে আমি সঁপে দিলুম। তুমিই আমার সবখানি হয়ে উঠলে। আমার যত আশা আর আকাঙ্ক্ষার, আমার সব কামনা আর কল্পনার মধ্যমণি হলে তুমি। আমার প্রতিটি মুহূর্ত তোমায় ঘিরে বিবর্তিত হতে লাগল।

বাবা মারা গিয়েছিলেন অনেক দিন আগে। সংসার ছাড়া আর কোন-দিকে তাকাবার অবসর মা'র ছিলনা। সামান্য পেনশনে কী করে সংসার চালাবেন, দিনরাত শুধু এই ভাবনাতেই তিনি অস্থির। বাড়ন্ত মেয়ের দিকে নজর দেবার ফুরসৎ তাঁর কই!

সহপাঠিনীরা? তারা সব আধা-শিক্ষিত অকালপাকা মেয়ে। স্বভাব-চরিত্রও কারো তেমন সুবিধের নয়। তাদের আমি সইতে পারতুম না। কি করে পারব! আমি যা পরম পবিত্র বলে মনে করি, তাই নিয়ে ওরা কিনা অশ্লীল টীকা-টিপ্পনি কাটে! তাছাড়া, আমি শুধু তোমাকেই জানি। শুধু তোমাকেই! অন্য কোন ভাবনা-চিন্তা নেই আমার। কিন্তু ওদের তো আর তা নয়। ওদের মন এটা-ওটা নানা বিষয় নিয়ে সদা মশগুল।

তুমি আমার হয়ে গেলে। কি করে বোঝাই আমার মনের সেই অবস্থা, কোন্ উপমা দিয়ে! সারাটা জীবনের মত তুমি আমার হয়ে গেলে। তুমি ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই, যেখানে তুমি নেই সেখানে আমি

৩

নেই। তোমার সাথে যার কোন সংস্রব নেই, আমার কাছেও তা অর্থহীন, অবান্তর। আমার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ওলট-পালট হয়ে গেল। তুমি—ওগো তুমিই তার হোতা।

এতদিন নিয়মিত ইস্কুলে যেতুম, যেতে হয় বলে। চোখে পড়ার মত ছাত্রী ছিলুম না। কিন্তু পরের পরীক্ষায় আমি হলুম প্রথম।

হব না, মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলুম। সব সময় বইয়ে মুখ গুঁজে থাকতুম। অনেক রাত অবধি পড়তুম। বইকে ভালো-বাসলুম। বাসব না, তুমিও যে বই ভালোবাসো গো। তুমিও যে কত পড়াশোনা কর!

শুধু কি লেখাপড়া? হঠাৎ পিয়ানো শেখার ভীষণ ঝোঁক চাপল। মা তো অবাক! রাতারাতি মেয়ের এত সুমতি! আমি কিন্তু অসীম ধৈর্যে পিয়ানো শিখতে শুরু করে দিলুম। কেন যেন মনে হল, গান-বাজনাও তুমি বড্ড ভালোবাসো।

নিজেকে তোমার কাছে পরিচ্ছন্ন ফিটফাট করে তুলতে হবে। অতএব বসলুম সুঁচ-সুতো নিয়ে, ছেঁড়া সাজ-পোশাক সেলাই করতে। ইস্কুলের জামাটার (মা'র পুরানো একটা সেমিজ কেটে তৈরী) এক জায়গায় অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেকথা ভেবে কী দুঃখই যে হত! পাছে এই ছেঁড়া জায়গাটায় কখনো চোখ পড়ে গেলে আমার প্রতি তুমি বিরূপ হয়ে ওঠ, তাই এই ছেঁড়াটাকে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে কী চেষ্টাই না করেছি। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ইস্কুলের ব্যাগ দিয়ে সে-জায়গাটা ঢেকে রাখতুম। সে কী ভয় আমার, সে কী বুক ধুকধুকুনি!

কী বোকাই যে ছিলুম! কিসের এত ভয়? আমার দিকে কি তুমি ফিরেও তাকাতে!

অথচ আমার সমস্ত দিন কাটত তোমারি প্রতীক্ষায়। তোমার আশা-পথ চেয়ে চেয়ে, তোমাকে দেখে দেখে। আমাদের সদর দরজায় একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটো দিয়ে তোমার ঘরের খানিকটা দেখা যেত। হাসছ? ওগো, হেসো না। সেদিনের কথা ভেবে, সেই কিশোরী গোয়েন্দার কথা মনে করে আজো আমি লজ্জিত নই।

ঘরটা ছিল ভয়ানক স্যাঁতসেঁতে, আধো-অন্ধকার। তাই ভয় হত, পাছে মা কিছু সন্দেহ করে বসেন। কত দীর্ঘ দীর্ঘ অপরাহ্ন তবু সেই ঘরটিতে আমার কেটে গিয়েছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কোলের ওপর বই খোলা, অপলক তাকিয়ে রয়েছি সেই ফুটো দিয়ে। বই ছুঁয়ে আছি, তোমার ছোঁয়া পাচ্ছি—তুমি যেন পাশটিতে এসে দাঁড়াতে। বইয়ের দিকে তাকাতুম, দেখতুম তোমায়। তোমার সাথে সাথে সাথী হয়ে ফিরতুম। তোমার পায়ে পায়ে ছায়া হয়ে ঘুরতুম। মনে মনে, ওগো, মনে মনে।

তুমি জানতেও না। তোমার পকেট-ঘড়িটির অস্তিত্ব কি সব সময় তুমি মনে রাখ? কিন্তু সর্বক্ষণ সে তোমার সঙ্গে রয়েছে, পরম বিশ্বস্ততায় তোমার প্রতিটি পল-অনুপলের হিসেব কষছে, নিয়ন্ত্রিত করছে তোমার সব কাজ। মুহূর্তের পর মুহূর্ত পেরিয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ মুহূর্তের অবিচ্ছিন্ন মিছিল—এরই মধ্যে কখন একবার তুমি তার দিকে তাকাবে সেই আশায় সে কাল গোণে। সে—সেই কিশোরী—আমি।

তোমার সবকিছুই আমার পরিচিত হয়ে গেল, প্রিয় হয়ে উঠল। তোমার প্রতিটি অভ্যেস, তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচরণও। কি কি রঙের টাই তুমি ব্যবহার করো, কোন্ কোন্ পোশাক পরো। তোমার প্রত্যেকটি স্যুট আমি চিনে ফেললুম। সেই সঙ্গে তোমার অতিথি-অভ্যাগতদেরও,

তোমার কাছে যারা নিয়মিত আসত। তাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা পর্যন্ত জেনে গেলুম।
তেরো থেকে ষোল—এই তিন বছরের প্রতিটি ঘণ্টা কেটেছে তোমায় ঘিরে। কত ছেলেমানুষীই যে করেছি তখন! তোমার পরশধন্য দরজার কড়া ধরে চুমু খেয়েছি। তোমার ফেলে-দেওয়া সিগারেটের টুকরোটি সযত্নে সঞ্চয় করেছি পবিত্র সম্পদের মত—তোমার অধরের অদৃশ্য দাগ যে এতে লেগে রয়েছে।
সন্ধ্যেবেলা নানা অছিলায় বারবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতুম। গিয়ে দাঁড়াতুম রাস্তায়। শুধু জানতে তোমার কোন্ ঘরে এখন আলো জ্বলছে, এখন তুমি কোথায়? তোমার সঙ্গ, মনেমনে হলেও, সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমার এই আকুলিবিকুলি। একেকবার কয়েক সপ্তাহের জন্যে তুমি যখন বাইরে চলে যেতে (তোমার বাক্স-বিছানা নিয়ে জনকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠত), জীবন আমার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠত। কোন কাজে আর মন বসত না, কোনকিছুই আর ভালো লাগত না। শরীর খারাপ হত, মন বিষণ্ণ। খিটখিটে হয়ে উঠতুম। আনমনে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতুম। আর থেকে থেকে দুই চোখ খালি জলে ভরে আসত। মা'র কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে ফিরতুম। পাছে ধরা পড়ে যাই।
জানি, একটি ছোট্ট মেয়ের অবাধ কল্পনাবিলাসের এক অবাস্তব কাহিনী আজ আমি পত্রাকারে রচনা করছি। জানি, এটা শুধু অবাস্তব নয়, হাস্যকরও। এর জন্যে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত, তাও জানি।
কিন্তু না, লজ্জিত আমি নই। এসব কথা বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জাও আমার হচ্ছে না। কারণ, আজ আমার প্রেম যত পবিত্র যত মহীয়ান হয়ে উঠেছে এমনটি আর কোনদিন হয়নি। আজকের মত এতখানি গভীরভাবে,

এত নিবিড় করে ভালোবাসতে আগে তোমায় পারিনি। সেদিন তুমি আমায় চিনতেও না, তবু সেদিনের কথা বলে, হারানো সেই অতীতের রোমন্থনে তোমার সঙ্গে আজ আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন!

সত্যিই তুমি সেদিন আমায় চিনতে না। যদি কখনো সিঁড়িতে দেখা হত, আচমকা যদি তোমার মুখোমুখি পড়ে যেতুম,—আপনা থেকেই মুখখানি আমার নিচু হয়ে আসত। তোমার দিকে চোখ তুলে চাইবার সাহস ছিল না, তোমার দৃষ্টির তাপ সইবার সাধ্য ছিল না। কোন মতে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে আসতুম। পালিয়ে বাঁচতুম।

আজ তুমি সব ভুলে গিয়েছ—সেদিনের সব কথা, সব স্মৃতি। আমি ভুলিনি। সেদিনের কথা বলে তোমার সাথে আজও আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। দিনের পর দিন। যে-অতীত তোমার জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ আজো আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয়। তার রোমন্থনে আমার ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই, আছে আনন্দের রোমাঞ্চ। যাক—

সেদিনের আর একটি মাত্র কথা তোমায় বলতে চাই—আমার কৈশোরের সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। হেসো না। এই সামান্য ব্যাপারটার কোন দাম তোমার কাছে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এ অমূল্য।

বোধ হয় রোববার। তুমি বাসায় নেই। তোমার চাকর ভারী ভারী কম্বলগুলো দরজার সামনে এনে ঝেড়ে-ঝুড়ে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলো টানা-হেঁচড়া করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে বেচারা। দেখে আমার বড় কষ্ট হল। সাহস করে একটু এগিয়ে গেলুম। তারপর তাকে সাহায্য করব কিনা মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করে ফেললুম।

জন তো অবাক। তবে আপত্তি করা দূরে থাক, সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হয়ে গেল।

তোমার ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলাম, তোমার ঘরে পা দিলাম। সেই প্রথম!

ভাবতে পারো, আমার তখনকার মনের অবস্থা, কল্পনা করতে পারো? সে যে কী অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের পুলক শিহরণ, কী সুগভীর শ্রদ্ধার স্বর্গীয় অনুভূতি! ওগো, কি করে তা বোঝাই—আমি কি তোমার মত লিখতে পারি! তোমার ঘরোয়া জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তোমার রাইটিং টেবিলের দিকে (টেবিলের উপর ফুলভর্তি নীলাভ একটি স্ফটিক ফুলদানি ছিল), দেয়ালের ছবি আর আলমারীর বইগুলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে যে অসহ্য আবেগের জোয়ার উথলে উঠেছিল তুমি কি আজ তা কল্পনা করতে পারবে?

কিন্তু না, সরাসরি কোনদিকে তাকাতে পারিনি—চোরের মত আড়চোখে শুধু একবার দেখে নিয়েছিলুম। বড় ভালো মানুষ ছিল জন। জানতুম, তাকে বললে সে-ই সবকিছু আমায় দেখাত। তবু বলিনি। বলতে পারিনি। সাহস পাইনি।

ওই এক পলকের চাউনিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তন্ময় হয়ে গেলুম। স্বপ্ন! স্বপ্ন! নিদ্রায় কি জাগরণে স্বপ্নই তো সম্বল আমার!

এই মদির মুহূর্তগুলি আমার কৈশোরের মধুরতম অধ্যায়।

আজ একথা কেন? কারণ, আমায় তো তুমি চেনোনা, আমার কথা শুনে যদি অন্তত বুঝতে পারো কি ভাবে তোমার জীবনের সাথে নিজেকে আমি জড়িয়ে ফেলেছিলুম, বিলিয়ে দিয়েছিলুম নিজেকে।

শুধু এই মদির মুহূর্তের কথা নয়, এর পরের ভয়ঙ্কর দিনগুলির কাহিনীও তোমায় আজ বলতে চাই।

আগেই বলেছি, সবসময় তোমার চিন্তায় আমি এমন তন্ময় হয়ে থাকতুম যে জগৎ-সংসারের কথা ভুলেও কখনো মনে পড়ত না। মা'র দিকে পর্যন্ত তাকাবার ফুরসৎ হত না, বাড়িতে কে এল না-এল তার খোঁজও রাখতুম না। তাই খেয়াল করিনি যে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছুদিন থেকে আমাদের বাসায় নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু করেছেন, একবার এসে দিনকয়েক কাটিয়েও গিয়েছেন। ভদ্রলোক মার দূর সম্পর্কের কি-রকম আত্মীয় হন, ইন্‌সিওরেন্সে ব্যবসা করেন।

মাকে তিনি মাঝে মাঝে থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। আমি এতে খুশিই হতুম। কেননা সে-সময়টুকু আমি একলা থাকতে পারি, নিরিবিলি আপন মনে স্বপ্নের জাল বুনতে পারি, নিরুপদ্রবে তোমার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত যাপন করতে পারি। এইতো আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

একদিন হোল-কি, মা আমাকে কাছে ডেকে গম্ভীর ভাবে জানালেন আমার সঙ্গে তাঁর কয়েকটি গুরুতর কথা আছে।

গুরুতর কথা! শুনেই আমার মুখ গেল শুকিয়ে, বুক উঠল কেঁপে। তবে কি মা সন্দেহ করেছেন, সব টের পেয়ে গিয়েছেন? আমিই কি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি? নিজের সাথে করেছি বিশ্বাস-ঘাতকতা?

সবার আগে মনে পড়ল তোমার কথা—আমার গোপন রহস্যের কথা। কিন্তু মা ওদিকে নিজেই তখন মহাবিব্রত। বলি বলি করেও মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারছেন না। এর আগে কোনদিন তিনি আমায় কাছে ডেকে চুমু খাননি, সেদিন একেবারে বুকে টেনে নিলেন, দুহাতে আমায় জড়িয়ে ধরে বারবার চুমু খেলেন। তারপর সোফায় পাশে বসিয়ে, মুখ নিচু করে, বেশ-খানিকটা লজ্জিত ভাবেই, বললেন যে আত্মীয়টি, মানে ওই বিপত্নীক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব

করেছেন। আর তিনি, শুধু আমার মুখ চেয়েই, তাতে মতও দিয়ে ফেলেছেন।

মার কথা শোনার সাথে সাথে আমার মনে পড়ে গেল তোমার মুখখানি। আশঙ্কায় দম বন্ধ হয়ে এল। জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমরা তো এখানেই থাকব, না মা ?'

'না মা, আমরা ইন্‌স্‌ব্রুকে চলে যাব। জানিস, ফার্দিনান্দের ওখানে চমৎকার একটা বাড়ি আছে।'

আর কিছু কানে এলনা। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

পরে শুনেছিলুম, আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। দুই করতল মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়েছিলুম।

পরের কদিনের ঘটনা তোমায় ঠিক ঠিক বলতে পারব না। বারবার বিদ্রোহ .করেছি, অসহায় এক কিশোরীর ব্যর্থ বিদ্রোহ। কে শুনবে আমার কথা! কে বুঝবে আমার ব্যথা! সেদিনের কথা ভেবে এখনও আমার শরীর হিম হয়ে আসছে, হাত কেঁপে যাচ্ছে, লিখতে পারছিনে। সত্যি কথাটা, আমার আপত্তির আসল কারণটা, মুখ ফুটে বলতে পারিনে, অথচ এ-বাসা ছেড়ে যেতেও আপত্তি প্রবল। তাই থেকে থেকে একটা অন্ধ আক্রোশে কেবলই ফুঁসে উঠি। মা মনে করলেন এ আমার অন্যায় বেয়াদবি। আমার কোন কথাই তিনি কানে নিলেন না।

যাত্রার আয়োজন শুরু হল, আমার অজান্তে। আমি যখন ইস্কুলে থাকতুম, তখন। প্রতিদিন ইস্কুল থেকে ফিরে দেখতুম, একটা-না-একটা জিনিস সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কিম্বা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আমার জীবনটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন দুপুরে খেতে এসে দেখলুম, আমাদের ফ্ল্যাট একেবারে খাঁ খাঁ

করছে, একটি আসবাবও আর নেই। শুধু তালাবন্ধ কয়েকটি তোরঙ্গ আর মা'র ও আমার ক্যাম্পখাট দুটি এক জায়গায় পড়ে রয়েছে। এ-বাসায় আর এক রাত্রির মেয়াদ আমার। কাল সকালেই রওনা হতে হবে, ইন্‌স্‌ব্রুকে।

শেষ বিকেল—শেষরাত্রি!

না না না, আমি পারব না—ওগো, তোমায় ছেড়ে, তোমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বাঁচতে আমি পারব না। তুমিই আমার সর্বস্ব, পৃথিবীর বিনিময়েও তোমায় ছেড়ে যেতে আমি পারব না। মনে মনে ঠিক করে ফেল্‌লুম। অবিশ্যি এত সুস্থির ভাবে ভেবে-চিন্তে কাজ করার সাধ্য তখন ছিলনা। মা বাসায় নেই। আমি উঠে দাঁড়ালুম। ইস্কুলের পোষাক ছাড়া হয়নি, সেই অবস্থাতেই তোমার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। কী করছি হুঁশ নেই, আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি শক্ত হয়ে গিয়েছে, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লাগছে। কী-এক চুম্বকের দুর্বার আকর্ষণ যেন আমায় টেনে নিয়ে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল তোমার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি, আকুল প্রার্থনা জানাই—ওগো, তুমি আমায় যেতে দিওনা, আমায় তুমি ছেড়ে দিওনা! দয়া করে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও অভাগীকে। চিরজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকব, দয়া করো, ওগো দয়া করো……

আজ ভয় হয়, আমার কথা শুনে, পঞ্চদশী এক বালিকার এই বাচালতায়, তুমি নিশ্চয় ঠা ঠা করে হেসে উঠতে। কিন্তু, যদি বুঝতে, কী দুর্বার সেই আকর্ষণ আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল! যদি বুঝতে, কেন সেই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ির উপর শিথিলশরীর চুপচাপ আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম, ছবির মতন! নিজের হাত দুটি নাড়াবার শক্তিটুকুও ছিলনা আমার। মনের ভেতরে চলছিল ঝড়ের মাতন।

কলিং বেল টিপলাম।
সমস্ত স্তব্ধতা চিড়ে হঠাৎ একটা খন্‌খনে আওয়াজ উঠল। সে-আওয়াজ এখনো আমার কানে বাজছে।
তারপর আবার স্তব্ধতা। আমার বুকের ধুকধুকুনি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে এল, উৎকর্ণ হয়ে রইলুম, এই বুঝি এলে তুমি! এই বুঝি এলে!
তুমি এলেনা! কেউ এল না!
সেদিন বিকেলে তুমি বোধ হয় বাসায় ছিলেনা। জনও না। ব্যর্থ হল আমার অভিসার। চোরের মত পালিয়ে এলুম নিজেদের ফ্ল্যাটে। কলিং বেলের আওয়াজ তখনো আমার কানে বাজছে, বুকে প্রতিধ্বনি তুলছে। ক্লান্ত, ভয়ানক শ্রান্ত আমি—তুষারঢাকা সুদীর্ঘ এক প্রান্তর যেন অতিক্রম করে ফিরেছি, বড় অবসন্ন আমি। বিছানায় লুটিয়ে পড়লুম।
তবু সেই অসীম ক্লান্তির, অশেষ শ্রান্তির অতল থেকেও একটি প্রতিজ্ঞার শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—তোমার সাথে দেখা করতেই হবে, সব কথা তোমাকে খুলে বলতেই হবে—আমাকে এখান থেকে জোর করে নিয়ে যাবার আগেই।
বিশ্বাস করো, আমার মনে তখন দৈহিক কামনার কণামাত্রও ছিলনা—বেশ জোর দিয়েই তা বলতে পারি। তখনো ওসব বিষয়ে আমি কিছু জানতুম না, তুমি ছাড়া আর কারো কথা আর কোনও কথা ভাবতুমও না। শুধু তোমাকে বারেকের তরে দেখতে চেয়েছিলুম। আমার মনের কথাটি শুধু বলতে চেয়েছিলুম। তার বেশি নয়, বিশ্বাস করো, তার বেশি আর-কিছু নয়।
বিকেলের পরে এল রাত। সে এক ভয়ঙ্কর রাত। সমস্ত রাত তোমার প্রতীক্ষায় জেগে রইলুম। মা এক সময় শুতে গেলেন, আমি

পালিয়ে এলুম হলঘরে। জানুআরির রাত্রি, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আমিও ক্লান্ত, সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। ঘরে বসবার মত একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই, আগেই সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। খালি মেঝের উপর শুয়ে পড়লুম। দরজার তলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে হাড়-কাঁপানো হাওয়া আসছে। পরনে পাতলা পোশাক, গায়ে একটা চাদরও নেই। দেহ যেন জমে যাচ্ছে।

যাক, তাই তো আমি চাই। ঠাণ্ডায় আধমরা হই তাও ভালো, তবু উষ্ণতার আমেজে যেন চোখ দুটি জড়িয়ে না আসে, ঘুমিয়ে যেন না পড়ি। তোমার পায়ের শব্দ শুনতে ভুল যেন না হয়।

শীতে অস্থির হয়ে একবার উঠে দাঁড়াই, আবার শুই। ওঠ-বস করি, বারবার। প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা, শুধুই প্রতীক্ষা। তোমার মুখ চেয়ে, আমার ভাগ্যের মুখ চেয়ে এই শীতজর্জর নির্জন অন্ধকারে প্রতীক্ষা আমায় করতেই হবে।

অবশেষে (তখন রাত্রিশেষ, ভোর হয়ে আসছে) সদরদরজা খোলার আওয়াজ হল। তারপর সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ।

মুহূর্তে শীতশিহরণ থেমে গেল, বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। আস্তে আস্তে দরজার পাট দুটি একটুখানি ফাঁক করলুম—তুমি কাছে আসা মাত্র ছুটে যাব, তোমার পায়ের তলায় নিজেকে লুটিয়ে দেব।…… সত্যি-সত্যি কী-যে তখন আমি করে বসতুম, আজ বলতে পারব না। পদশব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। একটা মোমবাতির থরথর শিখা চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে থরথরিয়ে উঠল আমার সমস্ত শরীর। দরজার কড়া ধরে কোনমতে নিজেকে সামলে রাখলুম। তুমি! হ্যাঁ, তুমিই উঠছ সিঁড়ি বেয়ে।

হ্যাঁ, তুমি, ওগো তুমিই। কিন্তু, একা তো নও। মৃদু হাসির কলধ্বনি

শুনলুম, রেশমী পোশাকের খসখসানি শুনলুম, আর শুনলুম তোমার কণ্ঠস্বর—চাপা গলায় তুমি কথা কইছ। তোমার পাশে একটি মেয়ে।
কী ভাবে যে বাকি রাতটুকু আমার কেটেছিল !
পরদিন সকালে ওরা আমায় ইন্‌স্‌ব্রুকে নিয়ে গেল। প্রতিরোধের সামর্থ্য আর আমার ছিল না।

গত রাতে খোকন আমার চলে গিয়েছে। যদি বেঁচে থাকি, আবার আমার জীবনে নেমে আসবে দুঃসহ একাকীত্ব। সত্যিই যদি বেঁচে থাকি !
কুৎসিৎ চেহারা আর বিচ্ছিরি পোশাকপরা অজানা অচেনা লোকেরা কাল আসবে, সাথে করে আনবে ছোট্ট একটি কফিন। আমার বাছাকে, আমার খোকনকে, আমার সোণামণিকে তারা নিয়ে চলে যাবে। হয়ত আসবে বন্ধুরাও, যথারীতি, ফুলের মালা নিয়ে।
কিন্তু, কফিনের উপর ফুল বিছিয়ে কী লাভ, বলো ? সবাই আমায় সান্ত্বনা দেবে, বাঁধা-ধরা বুলি ! মুখের কথায় সান্ত্বনা ! কথার ক্ষমতা কতটুকু ? কথায় কি সান্ত্বনা মেলে ! মন মানে ?
আবার আমি একা, এই শুধু সত্যি। মানুষের জীবনে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই, দুঃসহ এই একাকীত্বের চেয়ে। নির্জনতা মানুষের চরম অভিশাপ। ইন্‌স্‌ব্রুকে থাকবার সময় তার প্রমাণ আমি মর্মে মর্মে পেয়েছি।
ষোল থেকে আঠারো—দুবছর ইন্‌স্‌ব্রুকে ছিলুম। আপনার জনের সঙ্গে রয়েছি, তবু মনে হত, আমার যেন কেউ নেই, আমি যেন এক বন্দিনী। আমার সৎবাবা খুবই ভালোমানুষ, সন্দেহ নেই, আমার সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহারই করতেন। মা'কে দেখে মনে হত যেন ভীষণ একটা

অন্যায় করে ফেলেছেন, তাই আমার সব সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে তার ক্ষতিপূরণে তিনি সদা ব্যস্ত। সমবয়েসীরা আমার বন্ধুত্বের জন্যে হাত বাড়িয়ে থাকত। কিন্তু আমি কারো দিকে ফিরেও তাকাতুম না। নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করতুম সবাইকে।

কেন করব না? আমি তো সুখী হতে চাইনে! সুখী-সন্তুষ্ট জীবন কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ব্যথা আর বেদনা আর দুঃখ নিয়ে আমার নিজের গড়া জগতে আমি একা থাকতে চাই। হোক অন্তর্দ্বন্দ্বে হৃদয় আমার ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরুক—তাই তো আমি চাই।

আমার জন্যে নতুন নতুন পোশাক আনা হত, ছুঁয়েও দেখতুম না। সিনেমা-থিয়েটারে যেতুম না, বেড়াতেও না। সব সময় স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকতুম। বললে কি বিশ্বাস করবে, দুবছর ইন্‌সব্রুকে কাটালেও ওখানকার কোন পথঘাটই আমি প্রায় চিনিনে?

শোকই ছিল আমার সুখ, দুঃখই সান্ত্বনা। সমাজ-সংসারকে অস্বীকার করে, সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে শুধু ভাবতুম তোমার কথা। তোমার বিচ্ছেদ-বেদনার রোমন্থনে পেতুম আনন্দের আস্বাদ। তোমাকে ভর করে, শুধু তোমাতেই ভর দিয়ে বাঁচবার যে আজন্ম বাসনা আমার, মনের গোপনে তাকে সযত্নে লালন করতুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন চুপচাপ বসে থাকতুম ঘরের কোণে, বসে বসে ধ্যান করতুম তোমাকে, তোমার স্মৃতিকে, তোমার সাথে জড়িত আমার জীবনের নেহাৎ-নগণ্য ঘটনাগুলিকেও। মনের রঙ্গমঞ্চে স্মৃতির মহড়া চলত, অবিরাম। পুরনোকে পেতুম নব নব রূপে, নতুন করে। আমার কৈশোরে তোমার আবির্ভাবের শুভ মুহূর্তটি থেকে তার পরে যা-কিছু ঘটেছে সব আমার চোখের সামনে স্পষ্ট-

প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ে। আজও আমার মনে তা অক্ষয় অব্যয় হয়ে রয়েছে। মনে হয় এ যেন এই কালকের ঘটনা।

আমার জীবনের প্রাণ ছিলে তুমি।

একে একে তোমার সব বই কিনে ফেললুম। কোনদিন খবর-কাগজে তোমার নাম বেরুলে উল্লাসের আমার অবধি থাকত না! সেটা আমার উৎসবের দিন হয়ে উঠত। জানো, তোমার বইগুলি আমি এতবার পড়েছি না যে তার প্রত্যেকটি শব্দ পর্যন্ত আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছে? বিশ্বাস করবে? মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে কেউ যদি তোমার যে-কোন বইয়ের যে-কোন অংশ থেকে খানিকটা আমায় পড়ে শোনায়, বাকিটুকু আমি অনর্গল বলে দিতে পারি—আজো, এই তেরো বছর পরেও, তোমার লেখা প্রত্যেকটি শব্দ বেদবাক্যের মত পবিত্র আমার কাছে।

তুমি ছিলে বলেই আমি ছিলুম। তোমার অস্তিত্বই ছিল আমার পৃথিবী। খবর-কাগজে কোন সঙ্গীত-বাসরের বা নতুন নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীর বিবরণ পড়তে পড়তে আমি শুধু ভাবতুম, এর কোনটা তোমার ভালো লাগবে—যদি তুমি শুনতে যাও? সন্ধ্যে হওয়ার সাথে সাথে কল্পনায় তোমার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতুম, মনকে বলতুম, 'ওই ছাখ, উনি হলে ঢুকেছেন।...এই বার উনি বসলেন।' এই রকম কতনা কল্পনার হাজারো কল্পনার মালা গাঁথতুম বসে বসে। কেন জানো? এক গানের আসরে একবার যে তোমায় আমি দেখেছিলুম গো। শুধু একটিবার!

ভাবছ, আজ কেন এসব কথা? কেন মিছে এই পুনরাবৃত্তি? অসহায় এক কিশোরীর ব্যর্থবঞ্চিত জীবন-কাহিনী নতুন করে শুনিয়ে আর কী লাভ? আর, শোনাতেই যদি হয়—তোমাকে কেন? আমার দুঃখের

খবর কি তুমি রাখতে? স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিলে, তোমার প্রতি কী সুগভীর শ্রদ্ধা বুকে বয়ে চলেছে অতিসাধারণ এক কিশোরী মেয়ে?

কিন্তু, সত্যিই কি তখনো আমি কিশোরী?

সতোরোয় পা দিলাম।

আঠারো পেরোলাম।

রাস্তায় ছেলেরা এখন আমার দিকে ফিরে ফিরে চায়, আড়-চোখে তাকায়। আর তা দেখে মনে মনে খুশি হয়ে ওঠা দূরে থাক, গা আমার জ্বলে যায়। তুমি ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। পরিহাসচ্ছলেও আর কারো প্রেমে আমি পড়তে পারিনে, আর কারো সোহাগের কথা ভাবতেও না। তাই কেউ যদি আমার প্রতি স্নেহপরবশ হত, কি কিছুমাত্র দুর্বলতা দেখাত—তাকে আমি মনে করতুম অপরাধী, পাপী।

তোমার প্রতি আমার অনুরাগ তেমনি প্রগাঢ়, তবে দৈহিক পরিবর্তনের, চেতনার বিকাশের সাথে সাথে রূপ তার বদলাল। প্রগাঢ় অনুরাগ ক্রমে পরিণত হল দেহগত উগ্র কামনায়। সন্দেহ-কি, কিশোরীর মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ এক নারী এবার জেগে উঠেছে। অনভিজ্ঞা কিশোরী মেয়েটি যা বুঝত না, এই নারী তা বুঝল। শুধু আর মনের মিতালি নয়, দেহ-মন দিয়ে তোমায় চাইল সে।

আত্মদানের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলুম।

বান্ধবীরা মনে করত, আমি খুব লাজুক। ভীষণ ভীরু। হয়ত তাই। কিন্তু আমার জেদ ছিল ভয়ানক, যা করব বলে একবার স্থির করতুম তা থেকে কেউ আমায় বিরত করতে পারতনা। এখন আমার একটি মাত্র চিন্তা হল—ভিয়েনায় ফিরে যেতে হবে।

ফন্দিফিকির খুঁজতে লাগলুম। অন্যের চোখে এটা দুর্বোধ্য ঠেকল। সবাই ভাবল, মেয়েটার বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু অটুট আমার প্রতিজ্ঞায়।

আমার সৎবাবা অবস্থাপন্ন মানুষ, নিজের মেয়ের মত তিনি আমায় দেখতেন। তাঁকে বোঝালুম, আমি চাকরি করতে চাই, স্বাবলম্বী হতে চাই। অনেক বলা-কওয়ার পর তিনি শেষে মত দিলেন। তাঁর এক আত্মীয়ের দর্জির দোকান ছিল ভিয়েনায়। সেই দোকানে চাকরি নিয়ে ফিরে এলুম আমি।

আবার সেই ভিয়েনা। তোমার ভিয়েনা—আমার ভিয়েনা। কুয়াশা-বিষণ্ণ এক শরৎসন্ধ্যায় পা দিলুম ভিয়েনার মাটিতে। তখন আমার মনের যে কী অবস্থা, ওগো, তা কি তোমায় বলে বোঝাতে হবে? পা দুটি কোন্ দিকে আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তা-ও?

স্টেশনের গুদোম ঘরে তোরঙ্গটা ছুঁড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি এসে ট্র্যাম ধরলাম। ইস্, কী আস্তে আস্তে যে ট্র্যামটা চলছিল! এককেটা স্টপে গাড়ি দাঁড়ায়, ধাপে ধাপে আমার বিরক্তি বাড়তে থাকে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সেই বাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

তোমার ঘরে আলো জলছে, দেখেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। দুরদুর বুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলুম। চারপাশে তাকিয়ে কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে ভিয়েনাকে। একদিন আমি এখানে ছিলুম। তারপর যেন আমার মৃত্যু হয়েছিল। আজ ফের নতুন করে বেঁচে উঠেছি। এই শহরের প্রতিটি ইট-কাঠ-পাথরের সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ যেন। তোমার কাছে ফিরে এসেছি, আমরা স্বপন-কুমারের কাছে এসেছি—এই ভেবেই আমি নতুন করে বেঁচে উঠলুম। তোমার আর আমার, আমার তৃষিত আঁখি আর তোমার শরীরী

উপস্থিতির মধ্যে জানালার ওই পাতলা-উজ্জ্বল কাচটুকু ছাড়া কোন আড়াল আর নেই এখন। অবিশ্যি মনের দিক দিয়ে জানি, দুজনের ব্যবধান দুস্তর, আমাদের মাঝখানে রয়েছে অনেক পাহাড়ের আর উপত্যকার আর নদীর অন্তরাল।

কিন্তু সেকথা মনে জাগল না। তোমার জানালার পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছি, আর কী চাই? এখান থেকে তোমায় দেখতে পাব, এই পাওনাই যথেষ্ট। ওই তোমার ঘর, ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরে তুমি রয়েছ। ওই ঘরটুকুই আমার পৃথিবী। দুটি বছর ধরে এই মুহূর্তটির স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্নসম্ভব মুহূর্তটি এল এতদিনে।

মেঘমেদুর সারাটা সন্ধ্যা তোমার জানালার নিচে কাটিয়ে দিলুম, উপরের দিকে অনিমেষে চোখ রেখে। তারপর রাত হল। রাত বাড়ল। আলো নিভে গেল। নিজের আশ্রয়ে আমি ফিরে গেলুম।

শুধু কি সেই এক সন্ধ্যা! প্রতিটি সন্ধ্যায় আমি যেতুম, ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতুম! তারপর ফিরে আসতুম—আলো নিভে গেলে।

সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত আমায় কাজ করতে হত। বড়-বেশি পরিশ্রমের কাজ, হোক, এই আমার ভালো। কেননা কাজের হট্টগোলে আমার বুকের আলোড়ন চাপা পড়ে থাকে। কিন্তু ছটায় দোকানের ঝাঁপ নামার সাথে সাথে আমি ছুটে যেতুম আমার সেই প্রিয়তম স্থানটিতে। প্রিয়মিলনের আশায়, শুধু চোখের দেখায়।

প্রায় এক সপ্তাহ প্রতীক্ষার পর দেখা পেলুম তোমার, অপ্রত্যাশিত ভাবে। তোমার জানালার দিকে অপলক তাকিয়ে আছি, এমন সময় রাস্তা দিয়ে তুমি এলে। তোমাকে দেখার সাথে সাথে আমি ফিরে গেলুম আমার সেই হারানো কৈশোরে। আবার যেন তেরো বছরের ছোট্ট মেয়েটি হয়ে পড়লুম। মুখ লাল হয়ে গেল, দুই কান ঝাঁ ঝাঁ

করতে লাগল। চেষ্টা করেও তোমার চোখে চোখে চাইতে পারলুম না, মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে পালিয়ে এলুম। কেউ যেন আমায় তাড়া করেছে। আমি যেন চোর—হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছি।

পরে অবিশ্যি এই ছেলেমানুষির কথা ভেবে লজ্জা-আপশোসের অবধি রইল না। ছিঃ, ইস্কুলের মেয়েদের মত এ কী কাণ্ড করে বসলুম। আসলে আমি যে কী চাই তাতো এখন আর অস্পষ্ট নয়। তোমার সাথে, হ্যাঁ, তোমার সাথে আমি দেখা করতে চাই। চাই, এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে, এত ঝড়ঝাপটার পর এবার তুমি আমায় চেন, ভালোবাসো। গ্রহণ করো। তোমায় দেখা মাত্র আমি কিনা পালিয়ে এলুম!

রোজ সন্ধ্যায় তোমার জানালার নিচে গিয়ে নিয়মিত প্রতীক্ষা করতুম। প্রবল তুষারপাত বা ভিয়েনার হাড়-কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা সইতুম মুখ বুজে! জানালার দিকে অপলক চেয়ে থাকতুম। কতদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, তুমি আসোনি। আবার কখনো দেখতুম, বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাড়ি থেকে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ। দুবার তোমায় দেখলুম একটি মেয়ের সাথে। বাহুর বাঁধনে বাঁধা দুজনে। দেখে আমার শরীর-মন অসহ্য জ্বালায় জ্বলে গেল। যাবেনা? এখন যে আমি সাবালিকা হয়ে উঠেছি, সেই ছোট্ট খুকিটি তো আর নই।

তোমার পাশে মেয়ে দেখে অবাক হওয়ার কথা নয়। কেননা, ছেলেবেলা থেকে দেখছি তো, কতরকমের মেয়েপুরুষ আসে তোমার কাছে। এখন কিন্তু তোমার বাহুবন্ধনে মেয়েটিকে দেখে কী-এক ব্যথায় মনটা আমার হাহাকার করে উঠল। অন্য একটি মেয়ের সাথে তোমার এই অন্তরঙ্গতা দেখে ঈর্ষায় জ্বলে গেলুম, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল

বাসনার আগুন। আমার অহমিকায় আঘাত লাগল, অভিমানে ক্ষুব্ধ হলুম। সেই অহমিকা অভিমান থেকে আজো বোধ হয় মুক্ত হতে পারিনি। এর জন্যে তোমার ওখানে একদিন গেলুম না পর্যন্ত। রাগ করে তো গেলুম না, কিন্তু সারাটা সন্ধ্যা কী করে যে কাটল! সব কিছু শূন্য শূন্য মনে হয়, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। জীবনে যেন আর কিছু নেই—হাসি না গান না প্রাণ না, শুধু অনন্ত কান্না। চাপা কান্নায় কেবলি গলা বুজে আসে।

মানের বালাই ছুঁড়ে ফেলে পরের দিন ফের গিয়ে হাজির হলুম। দাঁড়িয়ে রইলুম জানাল নিচে। রুদ্ধদ্বার তোমার জীবনের দরজায় প্রতীক্ষা করতে লাগলুম—চিরদিন যা আমি করে গেলুম!

তারপর, একদিন, এল সেই শুভক্ষণ। আমায় তুমি চোখ তুলে দেখলে।

দূর থেকেই তুমি আসছ লক্ষ্য করেও বুক বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলুম। না, আজ আর তোমার পথ থেকে সরে যাবনা। আজ আর পালাব না ভীরুর মত।

ভাগ্যি ভালো, মাল বোঝাই একটা গাড়িও তখন রাস্তা দিয়ে আসছিল, তোমাকে তাই আমার পাশে সরে আসতে হল। আপনা থেকেই তোমার চোখ পড়ল আমার দেহের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তোমার মুখের ভাব, চোখের চাউনি। আমার চোখে যে বিমুগ্ধ তন্ময়তা ফুটে উঠেছিল তা তুমি খেয়াল করনি, তবু মেয়েদের দিকে তাকাবার সেই চিরাচরিত দৃষ্টিতে তুমি চাইলে আমার দিকে। সে-দৃষ্টি যেন আমার সারা শরীরে বিদ্যুতের তার ছুঁইয়ে দিল—সেই সোহাগমধুর কামনাতুর দৃষ্টি। এই দৃষ্টিপাত মনের গভীর পর্যন্ত দেখে নেয়, সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। অনেক দিন, অনেক

মাস, অনেক বছর আগে এই দৃষ্টির পরশমণিতেই না কিশোরীর বুক থেকে জেগে উঠেছিল এক নারী।

মাত্র একটি-কি-দুটি মুহূর্তের তরে তুমি তাকালে আমার দিকে। চোখা-চোখি হল। চেষ্টা করেও মুখ ফিরিয়ে নিতে পারলুম না। তারপর তুমি চলে গেলে। আমিই তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালুম, সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলুম—সারা বুক যে তখন আমার আথালিপাথালি করছে। সরে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালুম তোমার দিকে, বাঁধভাঙা কৌতূহলের বশে।

দুপা গিয়ে তুমিও দাঁড়িয়ে পড়েছ। অনিমেষ চেয়ে আছ আমার দিকে। তোমার চোখেও নাজানা বিস্ময়।

আমায় তুমি চেনোনি, বুঝলুম।

না, সত্যিই চেনোনি। সেদিনও না, পরেও না। ওগো, কোনওদিন তুমি চিনলে না আমায়!

কী করে আমার সেই পরাজয়ের বেদনা তোমায় বোঝাই! কি করে বোঝাব যে এ ধরনের ব্যর্থতা আমার জীবনে ওই প্রথম। সেদিনই যেন বুঝতে পারলুম—জীবনভর ব্যর্থতার পশরাই আমার শুধু বয়ে যেতে হবে। আমায় তুমি চিনবে না—কোনদিনও না। অপরিচিতার মত তোমার কাছ থেকে আজ আমায় চিরবিদায় নিতে হচ্ছে। হায়রে, এ যে কী মর্মান্তিক, বলে যদি তোমায় বোঝাতে পারতুম!

ইন্‌সব্রুকে থাকার সময় প্রতিটি মুহূর্ত শুধু তোমার কথা ভেবেছি। স্বপ্ন দেখেছি, ভিয়েনায় আবার তোমার সাথে দেখা হবে, আবার তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব, প্রাণভরে তোমায় দেখব। এ আমার জাগর স্বপ্ন। মন-মেজাজের অবস্থা অনুযায়ী এই স্বপ্নেরও রূপান্তর ঘটত—কখনও মধুর, কখনও-বা ভয়ঙ্কর। কত সম্ভব-অসম্ভব ছবিই না আঁকতুম মনে মনে। মনে মনে!

বিষণ্ণ মুহূর্তে মনে হত—তুমি আমায় বিমুখ করবে, আমায় দেখে তুমি নিশ্চয় বিরক্ত হবে। না হবার তো কারণ নেই। অতি সাধারণ নগন্য এক নারী আমি, তোমার যোগ্য আমি নই। তোমায় দেবার মত এ অভাগীর কীইবা আছে!

চোখের সামনে তোমার মুখখানি ভেসে উঠত—আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট। কিম্বা, নির্বিকার।

মরমে মরে যেতাম। বেদনায় মন গুমরে উঠত। তবু—তবু যত হতাশই হই, নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে যত ছোট ধারণাই করিনা কেন—একটি দুরাশা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারতুম না: আর যাই হোক, যতই বিরূপ হও, আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় তুমি সচেতন!

আজ বুঝি (তুমিই শিক্ষাগুরু), সব কিশোরীর বা প্রত্যেক নারীর মুখাবয়বে অত্যাশ্চর্য কোন-কিছু-একটার ছাপ থাকা দরকার, নইলে পুরুষ তার দিকে ফিরে চায়না। হোক এটা আয়নায় প্রতিবিম্বের মত, হঠাৎ-জেগে-হঠাৎ-মিলিয়ে-যাওয়া মনের ভাব-কল্পনার মত ক্ষণস্থায়ী—তবু প্রয়োজন এর অনিবার্য।

আজ যে নারী পরিচিত, কাল তার মুখ পুরুষ ভুলে যেতে পারে। কারণ বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখেও পড়ে বয়েসের বলিরেখা। নানা সময়ে নানান পরিবেশে সাজ পোশাকেও মেয়েদের রূপান্তর ঘটায়। শুধু কি তাই? নিজেকে জানার সাথে সাথে তার ছাপও ফুটে উঠে মেয়েদের চোখে মুখে। মুখের আদলই তখন বদলে যায়।

কিন্তু আমি? তখনও আমি এক কিশোরী মাত্র—তাই তোমার এই বিস্মৃতিতে বড় ব্যথা পেলাম। আমার সমস্ত হৃদয়মন জুড়ে তুমি রয়েছ, সেই প্রথম দিনটি থেকে। তোমাকে যেমন আমি ধ্যান করতুম,

তেমনি ভাবতুম তুমিও নিশ্চয় আমার কথা ভাবছ, আমার প্রতীক্ষা করছ। ঠিক আমারই মত। নইলে কি করে আমি বাঁচতুম বলো? তোমার কাছে আমার দাম নেই, তোমার স্মৃতিতে আমার নাম নেই —এ কি ভুলেও ভাবা যায়? এর পরেও কি বাঁচা যায়? বাঁচার সাধ থাকে, বলো?

কিন্তু ভুল আমার ভেঙে গেল—সেই দিন, সন্ধ্যায়। তোমার চোখের চাউনি বুঝিয়ে দিল, আমার জীবনের সঙ্গে সূক্ষ্মতম সূত্রের বাঁধনেও বাঁধা তুমি পড়নি। আমার তাসের প্রাসাদ ধ্বসে গেল। কঠিন-কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হলাম। ভাগ্যের লিপি পড়লাম। দুর্ভাগ্যের! আমায় চিনতে তুমি পারোনি। আরেক সন্ধ্যায় ফের তোমার সামনে পড়ে গেলাম। পরিচিতের মতই এবার তুমি আমার দিকে তাকালে। পরিচিতের মত! হায়রে! যে মেয়েটি তোমায় সর্বস্ব সমর্পণ করে বসে আছে, যার নারীত্বকে তুমিই জাগিয়েছ—এই কি তার দিকে তাকাবার দৃষ্টি! বছর আঠারোর একটি মেয়েকে তুমি কিছুটা চেন, বার দুয়েক আগে তাকে দেখেছ, এই সময় এই একই জায়গায়, তাই যেন কিছুটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। একটু যেন বিস্মিত হলে, একটু একটু হাসলেও। তারপর যথারীতি চলে গেলে, আমিও তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালুম। তোমার যাবার পথ করে দিলুম।

সেদিনের মত আজও বুকখানি তেমনি আথালিপাথালি করে উঠল। থরথর করতে লাগল সর্বশরীর। বারেক ব্যাকুল ভাবে তাকালুম তোমার মুখের দিকে—যদি তুমি একটি কথাও বল!

এই প্রথম বুঝলুম, শুধু তোমার কথা ভেবে ভেবে আর তৃপ্ত আমি নই, তোমাকেও আমার চাই। গভীরভাবে, একান্ত করে চাই।

ধীরে ধীরে আমি হাঁটতে লাগলাম। আজ আর তোমাকে এড়াতে

চাইনে, তোমার কাছ থেকে আজ আর পালাতে চাইনে। হঠাৎ—

হঠাৎ পিছনে তোমার পদশব্দ শুনলুম। বুঝলুম তুমি ফিরে আসছ। আমি কিন্তু ফিরলুম না, উৎকর্ণ হয়ে রইলুম। এই বুঝি কানে আসে প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর। এতদিনে বুঝি আমায় তার মনে পড়ল, এখুনি হয়ত সে আমার সাথে কথা কইবে। আমায় ডাকবে!

ভাবার সাথে সাথে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। মনে হল, নিজেকে আমি আর সামলাতে পারব না। আপনা থেকেই চলার গতি বন্ধ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়লুম।

তুমি এলে। পাশে এসে দাঁড়ালে। হাসলে। কথা কইলে—যেন কত কালের চেনা।

কিন্তু সত্যিই কি তুমি তখন আমায় চিনতে, আমার নামধাম কিছু জানতে? না। কিছু না। তবু এত সহজ আর এমন স্বাভাবিক ভাবে তুমি কথা কইতে শুরু করলে যে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে আমার বাধল না। তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

রাস্তা দিয়ে দুজনে হাঁটতে লাগলুম। তুমি জানতে চাইলে আজকের ডিনারটা একসাথে সারা যায় কিনা? রাজি হয়ে গেলুম। রাজি না হয়ে কি আমি পারি? ওগো, তোমার কথায় না বলার সাধ্যি কি আমার আছে!

ছোট্ট একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম আমরা। আহারপর্ব শেষ হল একসময়। সেই রেস্তোরাঁটির কথা তোমার হয়ত আজ মনে নেই। তোমার কাছে এ হয়ত অনেক রেস্তোরাঁর একটি। অতিসাধারণ—সামান্য। কিন্তু আমার কাছে? লাখে না মিলয়ে এক! এ আমার প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চকর এক অভিসারে অবিস্মরণীয় স্মৃতিতীর্থ।

এমন কী হয়েছিল সেই সন্ধ্যায়? আমাকে মনে রাখার মত কিছু কি ঘটেছিল? বেশি কথা আমি বলিনি। বলার মত অবস্থাও ছিল না। তোমাকে পাশে পেয়েছি, তোমার কথা শুনছি, আর কী চাই! আজেবাজে কথা বলে, বোকার মত প্রশ্ন করে একটি মুহূর্তও আমি বৃথা বয়ে যেতে দিতে চাইনি।

তুমি কথা বলছিলে। তোমার কথায় ছিল আমার মনের সায়! যে সংযত ব্যবহার তুমি করেছিলে কোনদিন তা আমি ভুলব না। আজীবন সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অধীর আগ্রহের পরিচয় দাওনি, কাঙালপনা করোনি। তবু প্রথম থেকেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলে, বন্ধুর মত আমায় বিশ্বাস করেছিলে। শুধু এরই জন্যে তোমার কাছে নিজেকে আমি বিলিয়ে দিতে পারতুম। আগে যদি কোনদিন তোমার সাথে দেখা নাও হত, আগে থেকেই যদি মনে মনে তোমায় সর্বস্ব দিয়ে না থাকতুম—তবু সেই সন্ধ্যায় তুমি আমাকে জয় করে নিতে অবলীলায়। এমনই মনোহর তোমার আচার-আচরণ।

আজ কি তোমায় বুঝাতে পারব যে এরই প্রতীক্ষায় দীর্ঘ পাঁচ-পাঁচটি বছর আমি বসে ছিলুম?

প্রত্যাশা আমার পূর্ণ হল, তপস্যা সার্থক।

বেশ রাত হতে আমরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলুম।

দরজায় দাঁড়িয়ে তুমি জিজ্ঞেস করলে, তাড়াতাড়ি ফেরার তাগিদ আমার আছে কিনা? তোমার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ সময় কি কাটাতে পারি?

কি করে আমি বলি যে ফেরার তাগিদ আছে? ওগো, আমি যে তোমারি—কী করে আর গোপন করি একথা? তোমার সাথে কি লুকোচুরি চলে?

বললুম, অনেক সময় আমার হাতে রয়েছে।

তুমি একটু ইতস্তত করলে। তারপর শুধোলে, খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার জন্যে তোমার ঘরে যেতে আমি রাজি কিনা ?

'নিশ্চয় ।' খুশিতে আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলুম। আমার প্রাণের কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, আমার জবাব শুনে, আমার এই এককথায়-রাজি-হয়ে-যাওয়াতে তুমি অবাক হলে। কিন্তু বিরক্তি, না আনন্দ—এই অবাক হওয়ার কারণ যে কি তা আমি ঠিক-ঠিক বলতে পারব না। তবে অবাক যে সেদিন হয়েছিলে, কোন ভুল নেই।

আজ বুঝি, কেন অবাক হয়েছিলে। আজ বুঝি, প্রিয়তমকে যত ভালোই বাসুক, আত্মদানের আগে সব মেয়েই অসম্মতির ভান করে, লজ্জা জানায়, কপট ক্রোধ দেখায়। এই রীতি, রেওয়াজ। অনুনয় করে সোহাগ জানিয়ে তাকে রাজি করাতে হয়। অনেক মধুর মিছে কথা বলতে হয়, অনেক অর্থহীন প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। একেই বলে পূর্বরাগ। ব্যতিক্রম অবিশ্যি আছে, গণিকাদের বেলায়। পেশাদার দেহপসারিণী তারা। পূর্বরাগ সেখানে নিষ্প্রয়োজন।

গণিকা, আর সরলমতি নাবালিকা—এদের কাছে পূর্বরাগের প্রয়োজন হয়না।

ওগো, তাই কি তুমি অবাক হয়েছিলে? হওয়াই স্বাভাবিক। তুমিই বা কি করে বুঝবে যে আমার এই এক-কথায়-সম্মতি-দানের পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের বাসনা-ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ? কত দীর্ঘ দিন আর সুদীর্ঘ রাত্রি—দিন রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে তোমায় পাবার প্রবল কামনাকে আমি লালন করে এসেছি—তুমি তার কী বুঝবে!

যাক, আমার ব্যবহারে তুমি সচেতন হয়ে উঠলে। আমার প্রতি তোমার

কৌতূহল জাগল। পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কথাবার্তার সময় লক্ষ্য করলুম, তুমি যেন আমায় মানিয়ে নিতে চাইছ। তোমার অন্তর্দৃষ্টি আর মানুষের মন সম্পর্কে তোমার গভীর জ্ঞান তোমাকে যেন জানিয়ে দিল কোথায় কী-একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার রয়েছে। এই ছোট্ট মেয়েটি তার চারপাশে টেনে দিয়েছে রহস্যের এক আবরণ।

তোমার কৌতূহল ঠেলে উঠল। নানা প্রশ্ন শুরু করলে। যে করেই হোক রহস্যভেদ তোমায় করতেই হবে। তোমার একেকটি প্রশ্ন যেন আমার হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীতে গিয়ে ঘা দিতে লাগল।

আমি কিন্তু তোমার প্রশ্নগুলি এড়িয়ে এড়িয়ে চললুম। তোমার কাছে বোকা হই, তাও স্বীকার, তবু আমার গোপন কথাটি আমি বলব না কিছুতেই।

তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌছলাম।

তোমার পাশে পাশে তোমার ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার মনের অবস্থা যে কী রকম হয়েছিল, তুমি ধারনা করতেও পারবে না। আমি যেন মাতাল হয়ে গিয়েছি। আনন্দের তীব্রতায় অকথ্য একটা যন্ত্রণা। থেকে থেকে দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে যে কী দুঃসহ আনন্দ—তোমার কল্পনাতীত। কল্পনাতীত বললুম বলে যেন রাগ কর না গো। সত্যি, সে এক অসহ্য অকথ্য যন্ত্রণাদায়ক আনন্দ। আজো সে-স্মৃতি মনে পড়লে চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে ওঠে।

কিন্তু না, আমার চোখের জলও আজ ফুরিয়ে গিয়েছে!

ওই বাড়ির প্রতিটি জিনিস আমার মনে আবেগের তরঙ্গ তুলল। যেদিকে তাকাই মনটা হু হু করে ওঠে। প্রতি পদক্ষেপে প্রিয়পরশের অনুভূতি। আমার শৈশবকামনার ধন ছড়ানো চারপাশে। ওই সেই দরজা—ওই দরজার আড়ালে কতদিন তোমার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনেছি।

এই সেই সিঁড়ি—এই সিঁড়িতে তোমার চরণধ্বনি শোনার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা উৎকর্ণ হয়ে থেকেছি। এই সিঁড়িতেই তো প্রথম তোমায় দেখেছিলুম। দরজার ফুটোটি অবিকল তেমনিই রয়েছে ওখানে চোখ পেতেই না তোমার চলাফেরা লক্ষ্য করতুম, আকুল আগ্রহে। ওই সেই পা-পোষ—কত রাত ওর ওপর নতজানু হয়ে বসে কাটিয়েছি।

তুমি দরজার তালা খুললে। তালা-খোলার শব্দটুকুও আমার অতি পরিচিত। এ যে তোমার আগমন-সংকেত!

কয়েক হাত এইটুকু ছোট্ট জায়গা—কিন্তু এরি মধ্যে আমার শৈশব কেটেছে, কেটেছে শৈশবের স্বপ্নরঙিন দিনগুলি। শুধুই কি শৈশব? আমার সারাটা জীবনই তো এই জায়গাটুকু কেন্দ্র করে ঘুরে মরছে। এই তো আমার সুখের স্বপ্ন, স্বপ্নের নীড়।

চারপাশে তাকিয়ে মনে ঝড়ের আলোড়ন উঠল। এতদিনে আমার সাধ, স্বপ্ন সার্থক। তোমার পাশে পাশে, তোমার সাথে সাথে চলেছি। চলেছি তোমার ফ্ল্যাটে, তোমার ঘরে। আমার বাস্তব পৃথিবীর সীমানা তোমার ঘরের দুয়ারে শেষ (কিছু মনে করো না, কথাগুলি হয়ত শ্রুতিকটু হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এর চেয়ে ভালো ভাবে মনের কথা বলার শক্তি আমার নেই), এ-বাস্তবতা আমার বিগত জীবনের একঘেয়ে দৈনন্দিনতার কলঙ্কে ক্লিন্ন। এরপরেই শুরু আমার শৈশব-স্বপ্নের বিচিত্র জগৎ। দরজার ওপারেই আলাদীনের সেই কল্পরাজ্য। যে দরজা দিয়ে এখন অবলীলায় প্রবেশ করছি, কত শত সহস্রবার আমার দুই চোখ তারই দোরে এসে মাথা কুটে ফিরে গিয়েছে!

ভেবে দ্যাখ, কেমন হয়েছিল আমার মনের অবস্থা তখন। সব বুঝবে না জানি, তবে কিছুটা আভাস অন্তত পেলেও পেতে পারো।

সে-রাত তোমার সাথে কাটালুম। আমার জীবনের প্রথম পুরুষ তুমি—তুমি হয়ত একথা ভাবতেও সেদিন পারোনি। ভাবতেও পারোনি যে তোমার আগে আর কেউ-ই আমায় ছোঁয়নি। আমার নিরাবরণ দেহটি পর্যন্ত ছাখেনি কেউ।

কি করেই বা ভাববে! আমি তো বারেকের তরেও বাধা দেইনি। নিজের লজ্জাকে আমি প্রাণপণে চেপে রেখেছি, পাছে আমার প্রেমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসি। পাছে ধরা পড়ে যাই। তাহলে তুমি হয়ত বিব্রত হতে। চাই-কি, ভয়ও পেতে। সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে যা আসে তাই তুমি হাত পেতে নাও—সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই তাকে চলে যেতে দাও। এতেই তোমার সন্তোষ। শুধু বর্তমানই কাম্য তোমার—অতীতের জের তুমি টানতে চাওনা, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবোনা। কারো জীবনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার কল্পনাতেও আতঙ্ক তোমার। পৃথিবীর সকলের কাছে অনায়াসে তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারো—কিন্তু কোন হাঙ্গামায় যেতে নারাজ।

আমার কৌমার্যকে সেদিন তোমার কাছে বিসর্জন দিয়েছিলুম—ভুল বুঝো না—সত্যিই। তাই বলে ভেবোনা যে, তোমার প্রতি কোন নালিশ আমার আছে। কেন থাকবে? তুমি তো আমার সাথে প্রতারণা করোনি, লোভ ছাখাওনি—মিথ্যে আশ্বাসে মন ভোলাওনি। আমিই সাধ করে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম। নিজের ভাগ্যের হাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিলুম। সেই স্মরণীয় রাতটির জন্যে তোমায় ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দেয় নেই আমার। সেই রাতটির জন্যে তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমি।

চোখ মেলে যখন চাইলুম—চারপাশে ঘন অন্ধকার, পাশে তুমি। মনে

হল, আমি স্বর্গে শুয়ে। কিন্তু কই, আকাশের তারারা তো আমার দিকে ঝিকমিক চোখে তাকিয়ে নেই! কোথায় তারা? ভারী অবাক লাগল। সত্যি, কী অবাকই যে সেদিন হয়েছিলুম!

না গো, না না—সে রাতের জন্যে, আমার সেই মহান আত্মদানের জন্যে, কোনদিন আমি অনুতাপ করিনি। কোনওদিনও না। পাশে তুমি শুয়ে রয়েছ, অঘোরে ঘুমোচ্ছ। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছি, বার বার তোমায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখছি। আর নিজেকে তোমার এত কাছে বলে মনে হচ্ছে! এ-ত অন্তরঙ্গ! আনন্দের যন্ত্রণায় দুই চোখ আমার জলে ভরে এল।

খুব ভোরে উঠে আমি চলে গিয়েছিলুম। কাজে যাবার তাড়া ছিল। তাছাড়া, তোমার চাকর ফেরার আগেই আমি চলে যেতে চেয়েছিলুম।

উঠব-উঠব করছি, একটি হাত দিয়ে তুমি আমায় জড়িয়ে ধরলে, তাকালে আমার মুখের দিকে, তাকিয়ে রইলে অনিমেষ।

কি দেখছিলে গো? কী ভাবছিলে সেদিন অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে? বিস্মৃত কোন স্মৃতির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল? নাকি, আমাকেই দেখছিলে? আনন্দের বন্যায় স্নান করে আমি কি সুন্দরতর হয়ে উঠেছিলুম—তোমার চোখে?

আমায় ধরে তুমি চুমু খেলে।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, বললে, 'কয়েকটা ফুল নিয়ে যাবে? নাও না?' রাইটিং টেবলের ওপর সেই সবুজস্ফটিক ফুলদানি (ছেলেবেলায় আড়ি পেতে কতবার এটা দেখেছি!)। ফুলদানিতে যেন ফুটে রয়েছে শাদা গোলাপ চারটি। ফুলগুলি তুমি আমার হাতে তুলে দিলে।

কতদিন সেই ফুলগুলি আমি বুকে চেপে ধরে নিবিড়ভাবে চুম্বন করেছি—ক-ত-দি-ন!

ঠিক হল, আরেক সন্ধ্যায় আবার আমরা মিলিত হব।

এল সেই সন্ধ্যা—

আনন্দ-বেদনা বিস্ময়-বিহ্বলতার মধ্যে কাটল আরেকটি রাত্রি।

আরও একটি রাত তুমি আমায় উপহার দিলে।

একদিন বললে, দিনকয়েকের জন্যে তোমায় একবার ভিয়েনার বাইরে যেতে হবে। জরুরি ডাক এসেছে।

জরুরি ডাক! ওগো, কি করে বোঝাব যে তোমায় এই জরুরি ডাক-গুলোকে মনেপ্রাণে কী ঘৃণাই আমি করতুম! কেন তুমি খালি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে।

কথা দিলে, ফিরে এসেই আমায় খবর দেবে।

আমার নাম তোমায় জানালুম না, ঠিকানা দিলুম ভুল। নিজেকে তোমার কাছে থেকে লুকিয়ে রাখলুম, গোপন রাখলুম আমার সত্যিকারের পরিচয়।

এবারও বিদায় নেবার সময় আমায় কটি ফুল দিলে।

তুমি চলে গেলে।

এদিকে দিন যায়। দিনের পর দিন। দু'দুটি মাস ধরে নিজের মনের সাথে আমি যুঝতে লাগলুম—না, আমার উৎকণ্ঠার কথা তোমায় কক্ষনো জানাব না। আমার আশা-নিরাশার কথা লিখে বিব্রত তোমায় করব না। তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার। তুমি যা, তোমার যা প্রকৃত পরিচয়—তাই আমার প্রিয়। কখনো তুমি উৎসাহ-উদ্দীপনায় উপছে ওঠো, কখনো-বা ভুলে যাও মুহূর্তের অতীতকে। একদিকে তুমি উদার, অন্যদিকে অবিশ্বাসী—এই দ্বৈতরূপের তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। বেসেছি জেনেশুনেই।

দুমাসের আগেই অবিশ্যি তুমি ফিরে এসেছিলে। তোমার ঘরে আলো

জ্বলতে দেখে আমি তা বুঝেছিলুম। কিন্তু ফেরার খবর তুমি আমায় দাওনি, চিঠি লেখনি।

আজ পর্যন্ত, জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তেও, তোমার লেখা একটি চিঠিও আমি পেলুম না। আমার সমস্ত জীবন আমি তোমায় উৎসর্গ করেছি—একছত্র লিখেও আমার খোঁজ তুমি কোনদিন নিলেনা! আমি শুধু প্রতীক্ষা করেই গেলুম—জীবনভর প্রতীক্ষাই শুধু করলুম! ওগো, তোমারই পথ চেয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় এই অভাগীর জীবন কাটল—কিন্তু আমায় তুমি একটিবারও ডাকলে না, একটা চিঠিও কোনদিন লিখলে না—একটি কথাও না···!

আমার ছেলে কাল মারা গিয়েছে। শুধু আমার নয়, ও তোমারও। তোমারই সন্তান—অবিস্মরণীয় সেই তিন রাত্রির কোন-একটির ফসল।

আমিও তোমারই ছিলুম। আমার জঠরে ওর আবির্ভাব থেকে জন্মের মুহূর্তটি পর্যন্ত একান্ত ভাবে তোমারই ছিলুম আমি। তোমার স্পর্শে আমি পবিত্র হয়েছিলুম, মহিয়সী হয়ে উঠেছিলুম—অন্য কোন পুরুষের সোহাগ-আদর কী করে তখন সইব!

ওগো, ও আমাদেরই সন্তান! আমার সজ্ঞান প্রেমের পুরস্কার। আমার সজ্ঞান প্রেম আর তোমার ভুলে-যাওয়া সোহাগের। আমাদের সন্তান—আমাদের ছেলে—একমাত্র খোকন আমাদের!

শুনে হয়ত তুমি চমকে উঠবে। কিম্বা, অবাক হবে কিছুটা! অবাক হয়ে ভাববে, ওর কথা কেন তোমায় আমি আগে বলিনি? আর বলিইনি যদি, আজ কেন—এই দীর্ঘ দিনের নীরবতার শেষে সবই যখন আজ শেষ হয়ে গিয়েছে, কেনই বা বলতে গেলাম! আজ—যখন ও ঘুমিয়ে পড়ছে কাল ঘুমে, চিরদিনের মত ছেড়ে গেছে আমায়!

কিন্তু, আগে কি করে তোমায় বলতুম, বলো? বলতুম কোন্ মুখে!

আমায় তুমি চিনতে না, পরিচয় আমার জানতে না। তোমার সাথে নিশিযাপনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কী তুমি দেখেছিলে আমার মধ্যে ?

বললেও কি তুমি বিশ্বাস করতে ? আমার মত অজানা-অচেনা পথে-পাওয়া একটি মেয়ে তোমার প্রতি, শুধু তোমারই প্রতি, বিশ্বস্ত ছিল —বিশ্বাস করতে ?

করতে না। অন্তত সহজে তো নয়ই। অনেক হাঙ্গামার শেষে যদিই-বা করতে, সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝতে আমায় ! খারাপ ধারনা হয়ে যেত আমার সম্পর্কে !

ভাবতে, আমায় বিশ্বাস করে তুমি ঠকেছ। তোমার উদারতার সুযোগ নিয়েছি আমি। অন্যের সন্তানের পিতৃত্ব, সুবিধে পেয়ে, অন্যায় ভাবে চাপিয়েছি তোমার উপর।

চিরকাল তোমার মনে এই সন্দেহটা থেকে যেত। চি-র-কা-ল। একটা অবিশ্বাসের কালো ছায়া তোমার আমার মাঝখানে অন্তরাল রচনা করত— চিরদিনের মত। সে আমি সইতে পারতুম না গো ! না না না—

তাছাড়া, তোমায় তো আমি চিনি। হয়ত নিজেকে নিজে তুমি যতখানি চেন, আমি চিনি তার চেয়েও বেশি। দায়দায়িত্বহীন প্রেম তোমার, আসা-যাওয়ার পথ খোলা রেখে ভালোবাসো তুমি। হাতের কাছে যা পাও তাই নিয়েও তুমি সন্তুষ্ট, আগ্রহ-আকুল হাত তুমি বাড়াও না। এই তোমার প্রেমের সংজ্ঞা,—প্রেমের জের টেনে চলতে নারাজ তুমি।

তাই হঠাৎ নিজেকে পিতৃত্বে অভিষিক্ত দেখলে তুমি বিব্রত হতে, বিরক্ত হতে। হঠাৎ একটি শিশুর ভাগ্যের সাথে নিজেকে জড়িত দেখলে, একেবারে ভেঙে পড়তে। বন্ধনহীন জীবনপথের পথিক তুমি—আমাকে তখন মনে হত পথের বাধা, পায়ের কাঁটা।

মনে মনে হয়ত বিবেকের কাছে মাথা নোয়াতে, মনের অগোচরে ঘৃণা করতে আমায়।

ওগো, তা কি আমি পারি? তোমার ঘৃণার পাত্রী হয়েও কি বেঁচে থাকা সম্ভব?

তোমার পথের বাধা হতে আমি চাইনি, নিজের জন্যে কোনদিন তোমায় বিব্রত করিনি—এই আমার অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই আমার সান্ত্বনা, সম্বল। সমস্ত দায় আমি নিজের মাথায় তুলে নেব, তোমায় দায়ী কিছুতেই করব না। তোমার বোঝা হব না।

অনেক মেয়েকেই তুমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতে। তাদের সাথে তোমার ছিল ক্ষণিক প্রেমের মিতালী। আমিও চেয়েছিলুম তাদেরই অন্যতমা হতে।

আর বাস্তবে কী হল! কোনদিন ভুলেও তুমি আমার কথা ভাবোনি। আমায় তুমি ভুলে গিয়েছ। তোমার মন থেকে নিঃশেষে আমি মুছে গিয়েছি।

না গো না, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিনে। বিশ্বাস করো, সত্যিই কোন নালিশ আমার নেই। তবু যদি মনে হয়, এ আমার অভিমান, আমার এই চিঠিতে অভিমানের আর্তি গুমরে গুমরে উঠছে—ক্ষমা করো, প্রিয়তম, ক্ষমা করো।

কেন করবে না ক্ষমা! আমার কথা একবারটি ভাবোতো! সামনে খোকন ঘুমিয়ে রয়েছে, এ-ঘুম আর ভাঙবে না। শিয়রে থরথর মোমবাতির শিখা, তার নিচে মানিকের ম্লান মুখখানি—না—না—এ আমি চোখ চেয়ে দেখতে পারিনে!

থেকে থেকে ভগবানের বিরুদ্ধে অসহায় ক্ষোভে ফুঁসে উঠছি—নিষ্ঠুর নির্দয় ভগবান! তুমি পাষাণ—তুমি খুনী—খুনী—

হ্যাঁ, ভগবানকে আমি খুনী বলেছি—এর জন্যে, ওগো, তুমি আমার

৭

দয়া করে ক্ষমা করো। আমি জানি তোমার কত দয়া, পরকে দয়া করতে তুমি সদাই প্রস্তুত। পথের ভিখিরিকেও তুমি বিমুখ করো না—এত সহৃদয় তুমি। এত দয়া তোমার।

অদ্ভুত তোমার এই দয়ার রূপ। কেউ হয়ত দুহাত ভরে পায়, যতখানি নিতে পারে আদায় করে নেয়। তবু বলব, অকৃপণ তুমি নও। এই দয়ার জন্যে তোমার কাছে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে হয়, প্রার্থনা জানাতে হয়। মুখ ফুটে যারা চায় শুধু তাদেরই তুমি দয়া করো। শুধু তাদেরই! লজ্জার হাত এড়াবার জন্যে তুমি দয়া করো, দয়া করো তুমি দুর্বলতার বশে—দয়ার আনন্দে দয়া তুমি কাউকেই করোনা।

কিছু মনে করোনা, স্পষ্টই বলছি—যারা দুঃখী যারা দুর্ভাগা তাদের সঙ্গ তুমি এড়িয়ে চল। জীবনে যারা সুখী যারা সন্তুষ্ট তারাই তোমার প্রিয়জন। তাই, যত দয়ালুই হও, কী করে তোমার দ্বারস্থ হতুম বলো?

কৈশোরের একটি দিনের কথা মনে পড়ে। এক ভিখিরি এসেছিল ভিক্ষে চাইতে। কিভাবে তুমি তাকে ভিক্ষে দিয়েছিলে সেই ছবিটি আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। দরজার ফুটো দিয়ে আমি দেখছিলুম —লোকটা মুখ ফুটে চাইবার আগেই তাড়াতাড়ি তুমি কিছু দিয়ে চলে এলে, ওর সামনে থেকে যেন পালিয়ে বাঁচলে। দান তুমি স্বেচ্ছায়ই করেছিলে, তবু মনে হল, ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছ! সে যে তোমার কী অস্বস্তি! কোনমতে ওর হাত থেকে রেহাই পেতে চাও। লোকটার চোখে চোখে চাইতেও তোমার ভয়, আতঙ্ক।

তোমার সেই ভীরু-বিব্রত মুখখানি আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি।

আর তাই, চরম দুঃসময়েও, তোমার কাছে হাত পাতিনি। ওগো, আমি জানি, একবার শুধু মুখ ফুটে চাইলেই আমার সব অভাব তুমি

মিটিয়ে দিতে। এ ছেলে তোমার কিনা সন্দেহ জাগলেও দিতে—জানি গো জানি। অর্থ দিতে, অগাধ অর্থ দিয়ে আমায় সাহায্য করতে, আমার জীবন প্রাচুর্যে ভরে দিতে--আমি জানি।

কিন্তু দিতে চাপা অস্বস্তির সঙ্গে—সেই ভিখিরির মত। ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াবার জন্যে দিতে—সেই ভিখিরির মত।

কিম্বা--এমনও মনে হয়েছে—হয়ত আসন্ন সন্তানের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পরামর্শ দিতে।

আর, এই আশঙ্কাই আমি করেছিলুম সব চেয়ে বেশি। কেননা তোমার কথায় না বলার সাধ্য তো আমার ছিলনা।

অথচ জীবনে সেদিন আমার সান্ত্বনা বলতে তো ছিল শুধু এই সন্তান—যে আসছে। এ সন্তান তোমার, তুমিই পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছ—কিন্তু এ-তুমি চিরচঞ্চল প্রেমিক তুমি নও, এ তোমারই আরেক রূপ। চঞ্চল প্রেমিককে বাঁধবার সাধ্য আমার ছিলনা, সে দুরাশাও করিনি—কিন্তু এ তুমি একান্ত আমার। এর সাথে আমার বত্রিশ নাড়ির সম্বন্ধ, আমারই রক্তমাংসে এর সৃষ্টি। এতদিনে, আকৈশোর তপস্যার শেষে, তোমায় পেয়েছি। এবার তোমায় আমি চিরকাল ধরে রাখতে পারব। এবার তুমি বন্দী আমার। তোমার রক্তধারা বইবে আমার শিরায় শিরায়। তোমায় লালন করব, সোহাগ জানাব, চুমু খাব—চোখে চোখে রাখব তোমায় সব সময়। আর কী চাই! এর বেশি আর কী চেয়েছিলুম!

তাই যখন টের পেলুম তোমার সন্তান আমার গর্ভে, আনন্দে আমি উদ্বেল হয়ে উঠেছিলুম।

তাই-ই সে-কথা গোপন রেখেছিলুম! এবার তো তুমি আর, আর তো তুমি এবার পালাতে পারবে না। আর তো আমার হাত এড়াতে পারবে না। এবার থেকে তুমি আমার, তুমি আমার—শুধু আমারই!

তাই বলে ভেবো না যে সেই প্রতীক্ষায় দিনগুলি আমার বড় সুখে কেটেছিল। সম্ভাবনার সূচনায় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলুম—তারপর শুরু হল দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস। দুঃখ আর মানুষের নীচতার ক্লেদাক্ত ইতিহাস। আর দীর্ঘশ্বাস।

বাঁচা যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শেষের দিকে চাকরি ছেড়ে দিতে হল। নইলে আমার সংবাবার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় টের পেতেন, টের পেলে মাকে না জানিয়ে ছাড়তেন না। চাকরি ছাড়লুম, দেখা দিল অভাব-অনটন। মার কাছে হাত পাততে পারিনে। এটাওটা টুকিটাকি জিনিস বিক্রি কোনমতে করে দিন চালাতে লাগলুম। সামান্য কিছু সঞ্চয় করেছিলুম, সময় বুঝে তাও চোরে নিয়ে গেল। কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লুম।

অগত্যা আশ্রয় নিতে হল মাতৃসদনে—বারোয়ারি হাসপাতালে।

আমার মানিকের—ওগো শুনছ, তোমার বাপির জন্ম হল এক সাধারণ মাতৃসদনে! সমাজচ্যুতা আর স্বজনপরিত্যক্তাদের মাঝখানে তোমার বাপি আমার কোলে এল!

কী ভয়ঙ্কর বিচ্ছিরি জায়গা সেটা! সবকিছু আমার কাছে অপরিচিত, সবাই আমার চোখে বিদেশির মত। কেউ আমরা কাউকে চিনিনে, পাশাপাশি শুয়ে থাকি, পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় বুক উথলে ওঠে। সকলেই আমরা পুরুষের শিকার—মিল শুধু এইটুকু। রক্ত আর ক্লোরোফর্মের গন্ধে, চিৎকারে আর গোঙানিতে ওয়ার্ডটা গম্ গম্ করছে, চারপাশে গিশগিশ লোকজন—এরি মাঝে এল পৃথিবীতে তোমার সন্তান।

এই সব হাসপাতালে মায়েরা নিজেদের ব্যক্তিসত্তা একেবারে হারিয়ে ফেলে—শিয়রে টাঙানো ডাক্তারি রিপোর্টটাই তার একমাত্র পরিচয় হয়ে

দাঁড়ায়। শয্যায় যে শায়িত সে যেন মানুষ নয়, জীয়ন্ত এক মাংসপিণ্ড মাত্র। ডাক্তারি ছাত্রদের পর্যবেক্ষণের সামগ্রী শুধু।

এসব কথা বলছি বলে, ক্ষমা করো। থাক তবে। দীর্ঘ এগারোটি বছর একটি কথাও আমি বলিনি, মুখ বুজে সব সয়ে এসেছি—সময় এসে গিয়েছে, চিরকালের মত এবার মুখ বুজব।

তবু একবার, ওগো, একটি বার শুধু আমায় চিৎকার করে কাঁদতে দাও। শুধু একবার বলতে দাও—আমার ওই খোকন সোনাকে পৃথিবীতে আনতে কত কষ্ট আমায় সইতে হয়েছিল।

পরে সে-সব আমি ভুলে গিয়েছিলুম। ওর হাসি, ওর আব্দার, আধো-আধো স্বরে ওর মা ডাক শুনে সব ভুলে গিয়েছিলুম, স-ব! ওকে বুকে পেয়ে বুক ভরে গিয়েছিল।

আর এখন, ও আমায় ছেড়ে গিয়েছে! তাই স্মৃতির প্রহারে যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে উঠেছি। তাই মুখ ফুটে তোমায় না জানিয়ে পারছিনে, পারলুম না।

কিন্তু—না, আবার বলি, তোমার প্রতি কোন অভিযোগ আমি করছিনে। শুধু ভগবান—শুধু সেই সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আমার যা-কিছু নালিশ। তিনিই এর জন্যে দায়ী—আমার এই অকারণ দুর্ভাগ্যের জন্যে তুমি নও, দায়ী ভগবান। মনে-মনেও কোনদিন, একটি দিনের তরেও, তোমার উপর আমি রাগ করিনি। এমন-কি, মাতৃসদনের সেই চরম দুরবস্থায়ও তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইনি, সন্তান-প্রসবের অসহ্য যন্ত্রণার সময়েও না।

অভিযোগ জানাইনি, তোমার সাথে নিশিযাপনের জন্যে অনুতাপও করিনি। তোমায় বরাবর ভালোবেসেছি, আমার জীবনে তোমার আবির্ভাবের মুহূর্তটিকে সাদরে বরণ করে নিয়েছি। প্রয়োজন হলে সেদিন আমি নরকে যেতেও রাজি ছিলুম।

আমাদের সন্তান কাল মারা গিয়েছে। আমাদের সন্তান, অথচ তুমি ওকে চিনতে না! তুমি ওকে চোখেও দেখনি। ওর জন্মের পর অনেকদিন আমি নিজেকে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তোমার জন্যে আমার ব্যাকুলতা, বাসনার জ্বালা তখন কমে এসেছিল ওকে কোলে পেলে তোমাকেই তো পেলাম। তখন আর নিজেকে ওর আর তোমার মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইনি। কেননা, আমি জানতুম আমায় বাদ দিয়েও তুমি সুখী হবে, কিন্তু আমায় ছাড়া ওর চলবেনা। কোলেপিঠে করে ওকে মানুষ করে তুলতে হলে। আর খুশিমত ওকে—শুধু ওকেই আমি আদর সোহাগ করতে পারব।

এতদিনে যেন তোমার জন্যে আমার অধীর আকাঙ্ক্ষার অবসান হল। আকৈশোর অন্তর্জ্বালার হাত থেকে মুক্তি পেলাম এতদিনে। জন্মান্তরের পথ পেরিয়ে তুমি আমার বুকে এলে, বুকের পাষাণ ভারটা নেমে গেল আমার। আর তোমার জন্যে মন হাহাকার উঠত না। দুদিন আগেও তোমায় তেমন করে মনে পড়েনি।

শুধু একটি দিন, বছরে এক দিন—তোমার জন্মদিন—ছিল এর ব্যতিক্রম। প্রতিটি জন্মদিনে তোমায় আমি এক গোছা শাদা গোলাপ উপহার দিয়ে এসেছি। শাদা গোলাপ! প্রেমের প্রথম রাতে এই শাদা গোলাপই না তুমি আমায় উপহার দিয়েছিলে, মনে পড়ে?

আচ্ছা, গত দশ-এগারো বছরে একবারো কি নিজেকে প্রশ্ন করেছ—জন্মদিনে কে তোমায় এই উপহার পাঠায়? কখনও কি মনে পড়েছে—কোনও এক মেয়েকে তুমিও একদিন এই উপহার দিয়েছিল? মনে পড়েছে? আমি জানিনে। জানতেও আর পারব না। দূর থেকে, নিজেকে নাজানা রেখে, ফুলের উপহার পাঠিয়েই আমি কৃতার্থ। বছরে একটি দিন! হারানো এক রাত্রির স্মরণেই আমি সন্তুষ্ট।

আমাদের খোকনকে তুমি কোনো দিন ছাখনি। দেখলে হয়ত তুমি ওকে ভালোবাসতে। হয়ত কেন, নিশ্চয় ভালোবাসতে। তাই তোমার কাছ থেকে এতদিন ওকে লুকিয়ে রেখেছি বলে নিজেকে আমি আজ ভয়ানক অপরাধী মনে করছি।

ঘুম ভাঙার সাথে সাথে যে হাসি আমার মানিকের মুখে ছড়িয়ে পড়ত, তুমি দেখলে না! ওর গভীর-কালো চোখ দুটি ছিল অবিকল তোমারই চোখের মত। আমার পানে—সারা পৃথিবীর পানে—তাকিয়ে ওর ওই খুদে খুদে চোখে আশ্চর্য এক খুশির রোশনাই জ্বলে উঠত। কী সুন্দর যে হয়েছিল! লাবণ্যে ঢলঢল মুখখানি। একরত্তি ছেলে, একেবারে কিন্তু তোমার ছাঁচে ঢালা। তোমারই এক শিশু সংস্করণ। বড় হয়ে না, ঠিক বাপের মত হয়ে উঠত, নির্ঘাৎ। তুমি যেমন জীবন নিয়ে খেলা কর, ও তেমনি খেলত ওর খেলনাগুলি নিয়ে। খেলতে খেলতে তন্ময় হয়ে যেত, হ্যাঁ গো, তোমারই মত। তারপর, হঠাৎ হয়ত হুঁশ হল, অমি করল কি, খেলা-ধুলো ফেলে বসল বই-পত্তর নিয়ে। বসে রইল চুপচাপ, গম্ভীর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঠিক তোমার মত।

ও যে জন্মান্তরিত তুমি গো!

কাজ আর খেলা—এই দ্বৈত রূপ ছিল তোমার বৈশিষ্ট্য। ওরও তাই। ওর সাথে তোমার যত বেশি মিল খুঁজে পেতুম, ততবেশি ওকে ভালোবাসতুম। পড়াশোনাতেও ও ভালো ছিল। ওর মুখে অনর্গল ফরাসি শুনে পাখির কাকলি বলে ভুল হত। ওর লেখার খাতাগুলি ছিল ক্লাসের সকলের চেয়ে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চেহারা? সুন্দর সুগঠিত এক ছোট্ট পুরুষ। গরমের ছুটিতে ওকে নিয়ে গ্রাদোয় যেতুম। সমুদ্রতীরে ওকে নিয়ে বেড়াতুম—মেয়েরা দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ত,

চুলে বিলি কেটে কেটে আদর করত। শুধু কি মেয়েরা? পুরুষরাও। সেমারিং-এ ও যখন রাস্তায় বেরোত, হাঁ করে তাকিয়ে থাকত সবাই। এ-ত সুন্দর ছিল। এত সুন্দর আর মনোরম। আর মন-কাড়ানিয়া।
গেল বছর ওকে কলেজ-ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলুম। হস্টেলে থেকে পড়ছিল। হস্টেলের য়ুনিফর্ম পড়তে হত—রাজরাজড়াদের মত পোশাক, বেল্টের একদিকে আবার ছোট্ট একটি তরোয়াল ঝুলছে—
আর এখন! শুয়ে আছে! ওর ছোট্ট বিছানায়! প্রাণহীন! বিবর্ণ দুই ঠোঁট! বুকের উপর আড়াআড়ি দুটি হাত! বাছা আমার!
ছেলের জন্যে কি করে আমি এত খরচপত্র করতুম ভেবে অবাক হচ্ছ, না? ভাবছ, এত টাকা পেতুম কোথায়? কিসের জোরে ওকে দশজনের একজন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলুম?
কোথায় পেতুম টাকা!
ওগো, অন্ধকারের আড়াল থেকে বলছি, শোনো, বেহায়ার মত বলছি, শোনো—আঁৎকে উঠোনা, মুখ ফিরিওনা: নিজেকে আমি বিক্রী করেছিলুম!
হ্যাঁ, নিজের দেহ আমি বিক্রি করেছিলুম। বারবধূতে পরিণত হইনি সত্যি, তবু, তবু—নিজেকে আমি বিক্রী করেছিলুম!
আমার বন্ধু ও প্রেমিকরা সকলেই ছিল অবস্থাপন্ন। প্রথম তাদের আমি খুঁজে বার করি, পরে আমাকেই তারা খুঁজে বার করত। কেননা হাজার হলেও আমি (কোনদিন কি তুমি চেয়েও দেখেছিলে?) সুন্দরী ছিলুম। যাদেরই আত্মদান করতুম তারা সবাই আমার অনুগত হয়ে থাকত। অন্ধ স্তাবকে পরিণত হত।
তারা সকলেই আমায় ভালোবেসেছিল—শুধু তুমি ছাড়া। আমি যাকে ভালোবাসতুম—সেই তুমি ছাড়া।

হ্যাগো, মুখ ফুটে একথা বললুম বলে আমায় কি তুমি এখন ঘেন্না করবে? না, আমি জানি, তা তুমি কথ্খনো করবে না। অবুঝ তো তুমি নও—নিশ্চয়ই সব বুঝবে। বুঝবে, যা-কিছু আমি করেছি সব তোমারই জন্যে—রূপান্তরিত তুমি তোমার সন্তানের মুখ চেয়ে।

দারিদ্র্য যে কী ভয়ঙ্কর, মাতৃসদনে থাকার সময় তার পরিচয় পেয়েছিলুম। বুঝেছিলুম, গরিবের দুনিয়ায় গরিবরাই মার খায় সব চেয়ে বেশি। চলতে চলতে যারা হাঁটু ভেঙে পড়ে, পায়ে পায়ে তারা পিষে যায়। তোমার সন্তান—তোমার বাপি—বস্তিতে মানুষ হচ্ছে, রাস্তা থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে, দুর্নীতি আর ব্যাভিচারের হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছে—এ আমি কল্পনাও করতে পারতুম না। ওর নরম তুলতুলে ঠোঁট দুটি দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে অশ্লীল গালিগালাজ—ভাবলেও শরীর শিউরে উঠত। দারিদ্র্যের পরুষ পরশে ওর দেহের কান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ওগো আমি কি তা চোখের ওপর সইতে পারি? তোমার ছেলের মা হয়ে কি তা সওয়া যায়? থাকা যায় হাত-পা গুটিয়ে?

সবসেরা জিনিসটি চাই তোমার সন্তানের, চাই বিশ্বের বিচিত্র ঐশ্বর্য-সম্ভার—বড় হয়ে ওকে যে তোমারই পথে চলতে হবে, বেছে নিতে হবে তোমার জীবন। তুমিই বেঁচে থাকবে ওর মধ্যে।

তাই, ওগো শুনছ, তা-ই আমি নিজেকে বিক্রী করেছিলুম। এর মধ্যে ত্যাগের কিছু নেই, আত্মাহুতির কোন প্রশ্ন এখানে ওঠেনা। তথাকথিত 'সম্মান' বা 'দুর্নামে'র কোন দাম ছিলনা আমার কাছে। এই পোড়া দেহটার একমাত্র মালিক ছিলে তুমি। সেই তুমি যখন আমায় ভালোবাসলে না, তখন দেহটা নিয়ে আমি যা-খুশি করিনে কেন কি তাতে আসে যায়, বলো?

আমার সঙ্গীদের সোহাগে, তাদের অতি-উগ্র কামনার নিষ্ঠুর পেষণেও আমার দেহমন কখনো আলোড়িত হত না, কোনও অনুভূতি জাগত না। আনন্দের সামান্যতম রোমাঞ্চও বোধ করতুম না। অথচ, ওদের অনেককে আমি শ্রদ্ধা না করে পারিনি। ওদের প্রেমের প্রতিদান দিতে না পেরে দুঃখ হত, ওদের প্রতি সহানুভূতি জাগত—তার বেশি নয়।

ওরা সকলেই আমায় অশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছে। আদর দিয়ে দিয়ে ওরা আমায় মাথায় তুলে দিয়েছিল। আমার কথায় সবাই উঠত বসত, ওদের দিয়ে যা-ইচ্ছে আমি করাতে পারতুম।

একজন ছিলেন বিপত্নীক। বয়েস হয়েছে, মান্যগণ্য ভদ্রলোক। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তিনিই তোমার ছেলেকে কলেজ-ইস্কুলে ভর্তি করে দেন। তিনি চেষ্টা না করলে ওখানে সীট পাওয়া যেতনা। তিন-চারবার উনি আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। ওঁকে বিয়ে করলে আজ আমি জমিদার-গৃহিণী হতে পারতুম, হতে পারতুম টাই-রলের এক মনোহর প্রাসাদ-দুর্গের রাণীসাহেবা। খোকনও অত্যন্ত স্নেহশীল এক বাবা পেত। আর আমি—সমস্ত রকম দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তিই শুধু নয়, সেই সঙ্গে পেতুম সর্বজনশ্রদ্ধেয় সহৃদয় একটি মানুষকে স্বামী হিসেবে। পারতুম নতুন সংসার রচনা করতে।

কিন্তু বারবার তাঁর প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। তিনি ব্যথা পাচ্ছেন বুঝেও করেছি। তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলে জীবনের শেষ কটা দিন নিরাপদ আশ্রয়ে নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটাতে পারব জেনেও করেছি। ইস্ তা যদি না করতুম! তাহলে, খোকন হয়ত এভাবে আমায় ছেড়ে চলে যেতনা। হয়ত! কেন ওঁর কথায় সেদিন রাজি হইনি!

কেন যে হইনি, তোমার কাছে তা গোপন করব না। আসলে, কোন বন্ধনে আমি নিজেকে বাঁধতে চাইনি। চিরদিন স্বাধীন থাকতে চেয়েছি, তোমার জন্যে—প্রিয়তম, তোমারই পথ চেয়ে। মনের গহনে, স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে দিয়ে কৈশোর স্বপ্নের রোমন্থন করতুম। স্বপ্ন দেখতুম তখনো! স্বপ্ন! হয়ত একদিন তুমি আমায় ডাকবে, একটি ঘণ্টার তরে হলেও কাছে টেনে নেবে আমায়। এই আশা—এই দুরাশা—এ-ই আমার জীবনের সাধ, স্বপ্ন। স্বপ্নে-চাওয়া এই একটি ঘণ্টা যদি জীবনে কখনও আসে—তাই আমি সব কিছু অস্বীকার করেছি। নিজেকে মুক্ত রেখেছি, প্রস্তুত থেকেছি—তোমার ডাক শোনার সাথে সাথে যেন সাড়া দিতে পারি। প্রতীক্ষা করেছি! প্রতীক্ষা!

সারা জীবনই তো তোমার জন্যে প্রতীক্ষায় কাটালুম—চেতনার সেই প্রথম মুহূর্তটি থেকে নারীত্বের জাগরণ পর্যন্ত—তোমার মুখ চেয়ে প্রতীক্ষাই শুধু করে গেলুম!

তারপর একদিন এল সেই বহুপ্রত্যাশিত মুহূর্তটি। তুমি অবিশ্যি আজো জানো না, কিন্তু এসেছিল।

এল সেই শুভক্ষণ, আমায় তুমি চিনলে না। না, চিনলে না। ওগো, আমায় তুমি কো-ন-দি-ন চিনলে না! কতবার তোমার সাথে দেখা হয়েছে,—থিয়েটারে, জলসায়, পার্কে, ক-ত জায়গায়। ক-ত-বা-র তোমার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছি, তোমায় দেখে আশায় বুক দুরদুর করে উঠেছে। আর তুমি?

অবলীলায় পাশ দিয়ে চলে গিয়েছ। ফিরেও তাকাওনি।

বাইরে থেকে আমি বদলে গিয়েছিলুম। সেই ভীরু লাজুক কিশোরী এখন পরিপূর্ণা নারী এক। অনিন্দ্যসুন্দরী—সবাই বলত। পরনে

ঝলমলে সাজপোশাক, চারপাশে মধুলোভীদের গুঞ্জন। কি করেই বা আমায় তুমি চিনবে! তোমার শয়নগৃহের ম্লান আলোয় লজ্জানত ভীরু-চকিত যে মেয়েটিকে তুমি দেখেছিলে তার সাথে এর কতো তফাৎ।

রাস্তায় দেখা হলে আমার সঙ্গীরা তোমায় নমস্কার করত, প্রতি-নমস্কার জানাতে তুমি। হয়ত-বা এক পলক তখন তাকাতে আমার পানে। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত চোখে। সে-চোখে ফুটে উঠত অপরিচয়ের বিস্ময়। নামমাত্র স্বীকৃতি-স্বাক্ষরও তাতে থাকত না। বড় ব্যথা পেতুম তোমার এই ব্যবহারে। বুক আমার ভেঙে যেত।

একদিনের কথা মনে পড়ে। অপেরায় গিয়েছি এক বন্ধুর সাথে।

এ কী—আমার পাশেই যে তোমার আসন!

অভিনয় শুরু হতে আলো নিভে গেল। তোমার মুখ আর দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছি, অনুভব করছি তোমার শরীরী অনুভূতি—একদিন যেমন করেছিলুম তোমার ঘরে, তোমার ঘনিষ্টতম সাহচর্যে। তোমার আমার মাঝখানে শুধু ভেল-ভেটে-মোড়া চেয়ারের হাতলটি। হাতখানি তোমার নেতিয়ে রয়েছে তার উপর।

কেবলি ইচ্ছে হচ্ছে—মুখ গুঁজে পড়ি, তোমার হাতে প্রাণভরে চুমো খাই। ওই হাতের প্রিয়পরশ তো একদিন আমি পেয়েছিলুম। ওদিকে অর্কেস্ট্রা বাজছে দ্রুতলয়ে, এদিকে তার ঝঙ্কারের সাথে তাল রেখে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে আমার এই কামনা—উন্মাদনা। জোর করে কোনমতে নিজেকে সংযত রাখলুম। তৃষিত ঠোঁটদুটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলুম।

প্রথম অঙ্ক শেষ হওয়ার পর বন্ধুকে বললুম, আর ভালো লাগছে না।

আমি চলে যেতে চাই। সত্যি, আর আমি সইতে পারছিলুম না। অন্ধকারে আমারই পাশটিতে তুমি বসে রয়েছ, অথচ কাছে থেকেও কত দূরে, কী দুস্তর ব্যবধান—বলো, এ কি সওয়া যায়?

এরপর আরও-একবার এসেছিল শুভক্ষণ। আর একবার মাত্র!

বছরখানেকের কথা, তোমার জন্মদিনের পরের দিন। তোমার ভাবনায় মশগুল হয়ে ছিলুম, কারণ তোমার জন্মদিনটিকে আমি বিশেষ একটি উৎসব হিসেবে পালন করতুম। সেদিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেলুম ফুল কিনতে। শাদা গোলাপ। এই শাদা গোলাপই তোমার জন্মদিনে প্রতি বছর আমি উপহার দিয়ে থাকি। উপহার দিই সেই রাত্রির স্মারক হিসেবে যার কথা তুমি ভুলে গিয়েছ। বিকেলে ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। ফেরার পথে এক জায়গায় দুজনে চা খেয়ে নিলুম। সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে গেলুম থিয়েটারে। এই বিশেষ দিনটিকে ও যাতে মনে করে রাখে, হেতু না জেনেও ভবিষ্যতে এই দিনটিকে ও যাতে উৎসব হিসেবে পালন করে তাই আমি চেয়েছিলুম।

পরের দিনটা কাটালুম আমার সেই সময়কার বন্ধুর সাথে। এ বন্ধু বয়েসে তরুণ, প্রাগের এক বড়লোক ব্যবসায়ী। দু বছর আমি তার সাথে ছিলুম। ও আমায় বড় ভালোবাসত, ও-ও আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল। আগের মতই অস্বীকার করেছিলুম আমি। কেন করে ছিলুম, ও বোঝেনি। কিন্তু ছেড়েও আমায় যায়নি। আমাকে আর আমার ছেলেকে ও অজস্র উপহার দিত। সবসময় পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করত। ভারী বোকা, তবু মানুষ হিসেবে বড় ভালো।

দুজনে গেলাম এক জলসায়। চেনা-শোনা অনেকের সাথে দেখা হল। জমজমাট আসর। রিংস্ট্রাসের এক রেস্তোরাঁয় দলবেঁধে খাওয়াদাওয়া

হল। তারপর হাসি-ইয়ার্কির মাঝখানে আমিই এক সময় প্রস্তাব করলুম—এবার কোন-এক নাচঘরে গিয়ে জোটা যাক।

সাধারণত এই সব জায়গার কথা ভাবলেই আমার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। আনন্দের নামে এখানে চলে হৈ-হুল্লোড়। মাতলামিরই নামান্তর সে-আনন্দ। এসব জায়গায় আমি পারতপক্ষে বড়-একটা যেতুম না। কিন্তু সেদিন যেন আমার আদিম প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তাই বুঝি নিজে থেকে ওই প্রস্তাব করেছিলুম। যা হোক, সঙ্গে সঙ্গে সবাই সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

কী-একটা দুর্বোধ্য আকাঙ্ক্ষা যেন আমায় পেয়ে বসেছিল সেদিন। কেবলি মনে হচ্ছিল, অভাবনীয় কিছু ঘটবে আজ, অপ্রত্যাশিত কিছু পেয়ে যাব।

নাচঘরে গিয়ে সবাই উপস্থিত হলাম। শেষ হল কয়েক পাত্র শ্যাম্পেন। কেন জানিনে, অনাস্বাদিত-পূর্ব এক আনন্দ-আবেগ জেগে উঠল মনের মধ্যে। আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলুম, শেষ করে চললুম গ্লাসের পর গ্লাস। গলা মেলালুম বারোয়ারি কোরাসে। ইচ্ছে হল, বেপরোয়া খুশিতে পাক খেয়ে খেয়ে নাচ শুরু করে দিই। কিন্তু, হঠাৎ—

হঠাৎ দপ করে নিভে গেল আমার উৎসাহের আলো। হিমশীতল একটা হাত দিয়ে কে যেন মুঠো করে ধরল আমার হৃদয়কে। তুমি—

তুমি বসে আছ সামনের টেবিলে, সবান্ধবে। অনিমেষ আমার দিকে, সহৃদয় সপ্রশংস দৃষ্টিতে। অনুরাগের ঝিলিমিলি তারায় তারায়।

তোমার এই চাউনির সামনে নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারলুম না, সমস্ত শরীর অসহ্য পুলকে রোমাঞ্চিত হতে লাগল। বারবার।

দীর্ঘ দশ বছর পরে আবার তুমি আমার পানে চোখ তুলে তাকালে। অবিকল সেই চাউনি!

আমি কেঁপে উঠলুম। সারাদেহ আমার থর থর করতে লাগল। হাতের পানপাত্রটা একটুর জন্যে পড়তে পড়তে রয়ে গেল। ভাগ্যি ভালো, সঙ্গী-সাথীরা কেউ আমার অবস্থা লক্ষ্য করেনি, নাচগান-হল্লায় তারা মশগুল।

তোমার চোখের দৃষ্টি অনুরাগে ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে, তোমার চাউনির অদৃশ্য ছোঁয়ায় আমার ভেতরেও জলে উঠছে কামনার শিখা। তবে কি—তবে কি এতদিনে সত্যিই আমায় চিনতে পারলে? নাকি, আমাকে অপরিচিতা ভেবেই তোমার বাসনার সোনা ঝিকিয়ে উঠেছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। দুই গাল লাল হয়ে গেল, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল—আবোল তাবোল বকতে শুরু করলুম।

তুমি কিন্তু বুঝেছিলে যে, তোমার চাউনিই আমায় মাতাল করে তুলেছে, বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।

মাথা নেড়ে আমায় পাশের ঘরে যেতে ইশারা করলে। তারপর বিল মিটিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। যাবার সময় ইশারার ফের জানিয়ে গেলে যে বাইরে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

আর আমি? ঠকঠক করে কাঁপছি, জরো রুগীর মত। কারো কথায় জবাব দেবার সাধ্য সেই। রক্তের তোড়ে শিরাগুলি ফেটে পড়তে চাইছে। দেহে-মনে ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা। এই সময়, আমারই ভাগ্যি, এক-জোড়া নিগ্রো মেঝে কাঁপিয়ে নাচ শুরু করল। যাকে বলে আদিম বর্বর নৃত্য, আর সেই সঙ্গে কানফাটা কর্কশ সঙ্গীত। সবাই তাদের দিকে ফিরে তাকাল। এই সুযোগ। আমি বন্ধুকে বললুম, এক্ষুনি আসছি। বলেই তোমার অনুসরণ করলুম।

লবিতে তুমি অপেক্ষা করছিলে। আমাকে দেখে খুশিতে মুখখানি

তোমার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এলে।

না, স্পষ্টই বুঝলুম, তুমি আমায় চিনতে পারোনি! সেই কিশোরীকেও না, সেই নারীকেও না! আবার তোমার কাছে আমি নতুন হয়ে ধরা দিলুম।

'সময় আছে? ঘণ্টাখানেক কাটাবে আমার সঙ্গে? চলোনা?' তুমি জিজ্ঞেস করলে। আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল তোমার স্বরে। অর্থের বিনিময়ে যে-মেয়েদের নিশীথ-সঙ্গিনী করা যায়, আমায় তুমি, সন্দেহ-কি, তাদেরই একজন বলে মনে করেছ।

'যাবে?'

'যাব!' জবাব দিলুম, আপনা থেকেই জবাবটা যেন বেরিয়ে এল। তোমার জিজ্ঞাসার আর-কোন জবাব তো আমার জানা নেই। তোমার কথায় না বলার সাধ্য তো আমার নেই, প্রিয়তম।

আরও একদিন, আমার প্রথম যৌবনে, এই একই জবাব দিয়েছিলুম তোমার জিজ্ঞাসার। দশ বছর আগে, মনে পড়ে, সেই রাস্তার অন্ধকার নির্জনে দাঁড়িয়ে? সেদিনও দিয়েছিলুম এমনি নিঃশর্ত সম্মতি।

'কখন?'

'যখন আপনার খুশি।' আমি বললুম। অনায়াসে। তোমার কাছে আমার লজ্জাকলঙ্কের ভয়!

কিছুটা বিস্মিত হয়ে তুমি আমার দিকে তাকালে। এ-বিস্ময়ের সাথে মিশে আছে সন্দেহ, কৌতূহল।

আমার এই এককথায় রাজি-হওয়া দেখে আরও-একদিন এই একই বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তোমার চোখে। দশ বছর আগে।

'এখন?' একটু ইতস্তত করে ফের জিজ্ঞেস করলে।

'বেশ তো। চলুন।'

সাজঘর থেকে আমার ওভারকোটটা আনতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে হল, আমাদের সকলের জিনিসগুলি একসঙ্গে জমা দেওয়া হয়েছে। টিকিটটা রয়েছে আমার সেই বন্ধুর কাছে। তার কাছে গিয়ে টিকিট চাওয়া এখন অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব তোমাকে হারানো। যে শুভলগ্নের জন্যে বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি, হাতে পেয়ে তা হেলায় হারাব ?

মন স্থির করে ফেললুম। শালটাই ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পা বাড়ালুম। শুধু ওভারকোটের কথা নয়, বন্ধুর কথাও মন থেকে মুছে ফেললুম। অথচ বন্ধুটি আমার সত্যিই হৃদয়বান, অনেকদিন ধরে ওর সাথে আমি রয়েছি। জানি, এভাবে চলে যাওয়া অন্যায়। বন্ধুবান্ধবের কাছে ওর লজ্জার আর অবধি থাকবে না। লজ্জা নয়? এমন মেয়ের প্রেমেই সে পড়েছে যে কিনা অজানা-অচেনা একটা লোকের চোখের ইশারাতেই পিছু পিছু তার রওনা হয়ে যায়! বেশ বুঝলুম, এটা বন্ধুত্বের অমর্যাদা, নিছক অকৃতজ্ঞতা, নীচতা। বুঝলুম, আমার এই ব্যবহারে ও ক্ষেপে যাবে, চিরতরে আমাকে ত্যাগ করবে। নিজের জীবন নিয়ে আমি জুয়া খেলছি, বুঝলুম, নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারছি। বুঝলুম, সবই বুঝলুম!

কিন্তু, আবার আমার অধরে তোমার অধরের পরশ পাব। আবার তোমার প্রেমের মধুর কাকলি শুনব। এর কাছে কী দাম ওই বন্ধুত্বের? কতটুকু দাম! জীবন নিয়ে জুয়া? কী তাতে যায় আসে!

আজ সব শেষ। তাই আজ মুখ ফুটে বলতে পারছি, ওগো শ্যাখো, তোমায় আমি কী ভালোই না বেসেছিলুম। আমার সর্বস্ব তোমার পায়ে সঁপে দিয়েছিলুম। যাবার আগে এই কথাটি জানিয়ে গেলুম।

মনে হয়, মৃত্যুর পরেও যদি তোমার ডাক এসে কানে পৌছোয়, শবশয্যা থেকেও আমি বেঁচে উঠবো। শুধু—শুধু তোমার ডাকে সাড়া দেবার জন্যে বেঁচে উঠবো।

দরজার কাছেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। উঠলুম দুজনে।

তোমার কথা শুনতে শুনতে তোমার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আনন্দের উন্মাদনায় আমি তখন মাতাল। অবিকল আগের মত। সমস্ত চেতনা কী-এক নেশার আমেজে আচ্ছন্ন হয়ে এল, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

সেই বাড়ি। সেই সিঁড়ি। সেই ফ্ল্যাট। অতি-পরিচিত সেই সবকিছু। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে দশ বছর আগেকার একটি রাতের কথা মনে পড়ল। সেদিনের সেই অনুভূতি ফিরে পেলুম—লিখে আজ সেকথা তোমায় বোঝাতে পারব না। অতীত আর বর্তমান একাকার হয়ে গেল, আমার সমস্ত সত্তা তোমার সঙ্গে মিশে গেল। দুজনে যেন একমন একপ্রাণ একাত্মা।

ঘরের তেমন কিছু অদলবদল হয়নি। নতুন কয়েকটি ছবি টাঙানো হয়েছে, বইয়ের সংখ্যা কিছু বেড়েছে, দু-একটি আসবাব নতুন এসেছে। নইলে সবই ঠিক তেমনি রয়েছে, সেই পরিচিত পরিবেশ।

রাইটিং টেবলের ওপর ফুলদানি, গোলাপের গুচ্ছ। এ গোলাপগুচ্ছ আমার। আগের দিন আমিই তোমায় এই ফুল উপহার পাঠিয়েছি, তোমার জন্মদিনে। এ আমারই স্মারকচিহ্ন। আমার—যার কথা তুমি ভুলে গিয়েছ, তোমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে যার নাম! আমার—যাকে দেখেও আজ তুমি চেনোনি! যাকে কাছে টেনে নিয়ে, বুকে চেপে ধরে, ঠোঁটে যার ঠোঁট রেখেও তুমি তাকে চিনলে না—সেই আমার!

তবু ফুলগুলি দেখে সান্ত্বনা পেলুম। নাইবা তুমি চিনলে আমায়, আমার দেওয়া উপহার তো আদর করে সাজিয়ে রেখেছ। এই উপহার আমারই প্রেমের প্রতীক।

বাহুবন্ধনে বাঁধলে আমায়।

আর-একটি অবিস্মরণীয় রাত কাটল তোমার সাথে।

তবু তুমি আমায় চিনতে পারলে না গো, তবু তুমি আমায় চিনতে পারলে না!

তোমার আদরে সোহাগে মধুর নির্যাতনে আমার দেহ-মন শিহরিত হল। বুঝলুম, তোমার কামনা প্রেমিকা আর বিনোদিনী বালিকার মাঝে বিভেদের সীমা টানেনা। সব তোমার চোখে সমান, সবাই সমান। নাচঘর থেকে আমায় তুমি নিয়ে এসেছ, তোমার কাছে অপরিচিতা এক বারবধূ ছাড়া কিছু নই আমি—তবু তোমার স্নেহে আর অনুরাগে অভিষিক্ত হলাম। ভদ্র ব্যবহার পেলাম। আমার দেহটি নিয়ে তুমি খেলা শুরু করলে, এ-খেলার মধ্যেও আছে ছন্দ, মাধুর্য। অহেতুক চাপল্য নেই, প্রাণমাতানো উন্মাদনা রয়েছে।

সেই পুরনো সুখানুভূতিতে আবার আমি অবশ হয়ে যাচ্ছি, অসহায় হয়ে পড়ছি। আর ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তোমার দ্বৈত-রূপের প্রকাশ। আত্মিক আকুতির সাথে সাথে যৌনকামনার সেই আশ্চর্য রূপায়ণ। এই যে দ্বৈত-রূপের তুমি, একেই তো আমি ভালোবেসেছি আশৈশব। এরই কাছে না নিজেকে দিয়েছি বিকিয়ে।

আর-কোন পুরুষের কাছে এমন সম্পূর্ণভাবে এ দেহ-মন সমর্পণ আমি পারিনি। আনন্দের এমন স্বর্গীয় আস্বাদও আর-কারো কাছ থেকে কখনো পাইনি। কোন পুরুষও তোমার মত অমন করে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারেনি। জানি, এ সাময়িক—জানি, এই

মদির মুহূর্তগুলির অবসানে সবকিছু তুমি ভুলে যাবে, আমিও হারিয়ে যাব বিস্মৃতির অতলে।

কিন্তু সেই বিস্মৃতি আসবে পরে। পরের কথা পরে। এখন আমার অতীত-ভবিষ্যত এককার হয়ে গেছে। কে আমি? আমি কে? অন্ধকার শয্যায় তোমার বুক ঘেঁষে শুয়ে এ কে আমি? আমি কি সেই কিশোরী—দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে দরজার আড়ালে যে তোমার প্রতীক্ষায় থাকত? নাকি, তোমার সন্তানের জননী আমি? মাতৃত্বের মহিমায় মহিয়সী নারী এক? না আমি, আমি—অপরিচিতা বারবধূ শুধু?

মায়াবী রাত্রির পরিবেশে তিনে মিলে এক হয়ে গেল। নতুন পুরাতনে মিতালী পাতালো। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলুম, ভগবান! এ মিতালী অক্ষয় হোক। অক্ষয় হোক। অক্ষয় হোক। চিরন্তন হোক এই মুহূর্তগুলি।

হায়রে, মায়াবী রাতও শেষ হয় এক সময়!

একসময় সকাল হয়!

দুজনেরই উঠতে দেরি হয়ে গেল। তুমি বললে চা খেয়ে যেতে।

দেখলুম, কে যেন এরই মধ্যে খাবার ঘরের টেবিলে চা-জলখাবার সাজিয়ে রেখে গিয়েছে।

চা খেতে খেতে কথাবার্তা শুরু হল, স্বাভাবিক স্বরে। আগের মতই তুমি খোলাখুলিভাবে কথা কইতে লাগলে। বোকার মত কোন প্রশ্ন করলে না, আমার সম্পর্কে কোন কৌতূহলও জানালে না। জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না—কী আমার নাম, কোথায় থাকি।

তোমার কাছে আমি নামহীন এক নারী, সাময়িক সঙ্গিনী, তার বেশি নয়। অবিকল আগের মত। কালকের রাত শেষ হয়ে গেছে, এই

সকালও শেষ হবে। আর আমিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব তোমার মন থেকে। অবিকল আগের মত।

জানালে দীর্ঘদিনের জন্যে তুমি দূর প্রবাসে যাচ্ছ। মাস দুই-তিন উত্তর-আফ্রিকায় কাটাবে।

তোমার কথাগুলি যেন তীরের মত বুকে এসে বিঁধল। হাহাকার করে উঠল মন—শেষ! শেষ! হায় হায়, সব শেষ হয়ে গেল! আবার সেই অতলান্ত বিস্মৃতি! সব শেষ! ইচ্ছে হল, তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি। তোমার পায়ে মাথা কুটে কুটে বলি, 'ওগো, আমায় তোমার সাথে নাও। ওগো নিঠুর, আজো তুমি আমায় চিনলে না! এখনও চিনলে না! চিনবে, চিনবে, একদিন নিশ্চয় আমায় চিনবে। ওগো, আমাকেও নিয়ে চল।'

হায় ভীরু প্রেম! একটি কথাও মুখ ফুটে আমি উচ্চারণ করতে পারলুম না। আমার সংকোচ আর ভীরুতা, আমার ভীরুতা আর দুর্বলতা প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল।

মুখ দিয়ে শুধু বেরোল, 'ভারী দুঃখের কথা!'

'দুঃখের কথা? সত্যিই কি তুমি দুঃখিত হবে?' আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তুমি জিজ্ঞেস করলে।

মুহূর্তের জন্যে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলুম। উঠে দাঁড়ালুম। তোমার দিকে তাকালুম। তাকিয়ে রইলুম। অপলক।

'আমি যাকে ভালোবাসি, চিরকালই,' ধীরে ধীরে বললুম, 'চিরকালই সে আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়! দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়।'

এইবার, মনে মনে ভাবলুম, এইবার তুমি চিনবে আমায়। এইবার নিশ্চয় চিনবে।

হায়রে!

তুমি শুধু হাসলে। মৃদু সান্ত্বনার সুরে বললে, 'একদিন দূরের মানুষও ফিরে আসে।'

'হ্যাঁ, আসে। ফিরে আসে, কিন্তু—কিন্তু ততদিনে সে সব-কিছু ভুলে যায়। সবকিছু!'

কথাগুলি বলবার সময়, বোধ হয়, আবেগে আমার গলা বুজে এসেছিল। কেননা দেখলুম, তুমি বিচলিত হলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে। আমার দিকে বিস্মিত কোমল দৃষ্টিতে তাকালে।

আমার কাঁধে হাত রেখে দরদী গলার বললে, 'যা শুভকর, যা সুন্দর, কেউ তা ভোলে না। দেখ, আমি তোমায় ভুলব না।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় তুমি দেখতে লাগলে। যেন মনের পটে এইভাবে আমার একটা স্থায়ী ছবি এঁকে নিতে চাও।

তোমার সেই অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টির সামনে আমার সমস্ত সত্তা যেন উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। আমার গোপন রহস্য ভেঙে খান খান হয়ে গেল যেন। আশা হল, এইবার হয়ত খসবে তোমার অন্ধত্বের যবনিকা। 'এবার ও আমায় চিনবে। এবার আমায় ও নি-শ্চ-য় চিনবে!' মনকে বললুম। প্রত্যাশায় হৃদয় থরথর করতে লাগল। এইবার চিনবে! হায়রে!

চিনলে না। না, তবু না। এখনকার মত এতখানি অপরিচিত আগে আর কখনো আমি তোমার কাছে ছিলুম না। তা না হলে একটু তুমি যে কাণ্ড পরেই করলে কক্ষনো তা করতে পারতে না। আবার তুমি আমায় বুকে টেনে নিলে, চুমো খেলে—মাতালের মত চুমো খেয়ে চললে। আমার চুল এলোমেলো হয়ে গেল, ফের বেশবাস ঠিকঠাক করে নিতে হল।

আর, আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লজ্জায় ঘৃণায় আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম।

ওগো, এ কী তুমি করেছ! এ কী করেছ! আমার দস্তানার ফাঁকে লুকিয়ে ছুটি ব্যাঙ্ক নোট পুরে দিয়েছ! ছি ছি ছি! ছি ছি ছি!

অনেক কষ্টে রোধ করলুম চোখের জল। ইচ্ছে হল, ঠাস করে তোমার গালে একটা থাপ্পর কষিয়ে দি—প্রাণপণে সংযত করলুম নিজেকে।

শেষ পর্যন্ত তুমি আমায় টাকা দিলে! তোমায় সাথে রাত্রিবাসের পারিশ্রমিক নেব—আমি! আমি—যে আকৈশোর তোমাকে, শুধু তোমাকেই ভালোবেসে এসেছে, তোমার সন্তানের জননী হয়েছে! তাকে কিনা তুমি টাকা দিয়ে অপমান করলে! ছী-ছি-ছি!

কেনই বা করবে না! নাচঘর-থেকে-ধরে-আনা বাজারের এক বেশ্যা বই তো তোমার কাছে কিছু নই আমি!

ওগো পাষাণ, আমাকে ভুলে গিয়েও বুঝি মন ভরেনি, তাই সেদিন টাকা দিয়ে এ ভাবে আমায় অপমান করেছিলে?

তাড়াতাড়ি আমি নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলুম, যত শিগগীর পারি তোমার কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। অসহ্য এ-যন্ত্রনা। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

টুপিটার খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, ওটা রয়েছে রাইটিং টেবলের ওপর, শাদা গোলাপ-ভরা ফুলদানিটার পাশে। হঠাৎ গোলাপগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারলুম না। আমারই এ পুষ্প-উপহার। অফুরান প্রেমের প্রতীক আমার।

গোলাপগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে সাধ জাগল, দেখি না আর-একবার চেষ্টা করে—শেষ পর্যন্ত যদি খোলে তোমার স্মৃতির কপাট। যদি মনে পড়ে। যদি—

'ওখান থেকে আমায় একটা ফুল দেবেন?'

'নিশ্চয়।' সঙ্গে সঙ্গে তুমি বললে। তারপর শুধু একটা নয়, ফুলদানি থেকে সবগুলো ফুল তুলে আনলে।

'সব দেবেন? কোন মেয়ে বোধ হয় আপনাকে এই উপহার পাঠিয়েছে। মেয়েটি বোধ হয়—বোধ হয় মেয়েটি আপনাকে ভালোবাসে।'

'হতে পারে।' তুমি বললে, 'আমি জানিনে। এগুলো উপহার পেয়েছি সত্যি, কিন্তু কে দিয়েছে বলতে পারব না। তাই ফুলগুলি আমার বড় প্রিয়।'

আমি অর্থবহ দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকালুম। বললুম, 'হয়ত এমন-কোন মেয়ে যার কথা তুমি ভুলে গেছ।'

তুমি চমকালে। আমার দুই চোখ প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠল—'প্রিয়তম, এখনো তুমি আমায় চিনলে না?' অন্তরাত্মা বোবাকান্নায় ফেটে পড়তে চাইল 'ওগো, এখনো সময় আছে! ওগো, চিরবিদায়ের আগেও কি আমায় চিনবে না।'

তুমি হাসছ। অমায়িক অন্তরঙ্গ হাসি। কিন্তু পূর্ব-পরিচয়ের কোন চিহ্নই সেখানে নেই। আবার আমায় বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেলে। হায়, তবু চিনতে পারলে না!

আমার চোখে জল উপছে এল। পাছে তুমি তা দেখতে পাও, তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলুম। দরজার সামনে একটুর জন্যে তোমার চাকর জনের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে সামলে নিলুম। বিব্রত ও বিরক্ত ভাবে জন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল, দরজাটা ভালো করে খুলে ধরল।

মুহূর্তের জন্যে কান্না-ভেজা চোখ দুটি তুলে তার দিকে তাকালুম আমি, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের মুখে দেখা দিল হঠাৎ আলোর ঝলকানি। অথচ, আশ্চর্য কি জানো, সেই কোন্ দূর শৈশবে ও আমায় দেখেছিল, তারপর এই প্রথম দেখা।

জনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন আমার কানায় কানায় ভরে গেল। ইচ্ছে হল, ওর সামনে নতজানু হয়ে বসি। ওর হাতদুটি ধরে একবার চুমো খাই। দস্তানার ফাঁক থেকে সেই ব্যাঙ্ক নোট দুটি নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলুম। যে টাকা দিয়ে তুমি আমায় অপমান করেছিলে, সেই টাকা পেয়ে ও-ও যেন আঁৎকে উঠল। ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠল ব্যথাবিহ্বল ছবি। সারা জীবনে তুমি আমায় যতটুকু চিনেছ, এই এক মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক—অনেক—অনেক বেশি করে ও আমায় চিনলে।

ওগো, সবাই আমায় চিনেছে। সকলের দয়াই আমি পেয়েছি। শুধু তুমি ছাড়া। তুমিই শুধু আমায় ভুলে গিয়েছ। তুমি, ওগো, তুমিই কেবল আমায় চিনলে না গো!

আমার মানিক, আমাদের খোকন আজ নেই। ভালোবাসার মত কেউ আর আমার রইল না। এত বড় পৃথিবীতে একজনও না, তুমি ছাড়া।

তুমি আছ, মন তবু প্রবোধ মানে কই! তুমি তো আমায় কোনওদিন, একটি দিনের তরেও চিনলে না। স্রোতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পার হবার মত আমায় তুমি পেরিয়ে গেছ, পথের পাথরের মত মাড়িয়ে গেছ আমায়। ওগো, আপন পথের পথভোলা পথিক, ফিরেও তাকাওনি আমার পানে। আমি কি অনন্তকাল ধরে তোমার পথ চেয়ে থাকব? জন্মজন্মান্তর ধরে?

একসময় ভাবতুম, তোমায় আমি বাঁধতে পারি। স্বপ্ন দেখতুম, সন্তানের মধ্যে দিয়ে তোমায় আমি ধরে রেখেছি, বন্দী করেছি! কিন্তু তোমারই তো ছেলে! তোমারই মত নিষ্ঠুর, তোমারই মত হৃদয়হীন। রাতের আঁধারে তাই দুষ্টুটা আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল, নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ও-ও আমায় ভুলে গেল! আর কোনদিন ও ফিরবেনা! ও-ও আমায় চিনল না!

আবার আমি একা। আগের চেয়ে অনেক-বেশি দুঃসহ এই একাকীত্ব। তোমার কোন স্মৃতিই আর রইল না। সন্তান নয়, সান্ত্বনা নয়, একটুকরো চিঠিও নয়। তোমার কাছে আমার দাম নেই, তোমার স্মৃতিতে আমার নাম নেই। যদি কখনো, যদি কোনদিন কেউ আমার নাম তোমার কাছে উচ্চারণ করে, আ'মায় তোমার মনে পড়বে না। আমার নামটাও যে তোমার অপরিচিত। তোমার কাছে আমি নামগোত্রপরিচয়-হীন, মৃত।

তোমার কাছেই যখন মৃত, বলো প্রিয়তম, মৃত্যুই কি তখন আমার একমাত্র কাম্য নয়? তুমি যখন আমার কাছে থেকে দূরে সরে গিয়েছ, বলো, কার আশায় আর থাকব? তাই তো মৃত্যুকে বরণ করছি।

প্রিয়তম, তোমায় দোষ দিইনে। আমার দুঃখের পশরা নিয়ে তোমার আনন্দমুখর জীবনের মাঝখানে দাঁড়াতে চাইনে। ভয় পেওনা, আর কোনদিন তোমায় বিরক্ত করতে আসব না। শুধু একবার, এই শেষবার—মৃত সন্তানের পাশে বসে যে অমানুষিক কষ্ট আমি সইছি, তার ক্ষণিক সমব্যথী তুমি হও। আমার জন্যে দু ফোঁটা চোখের জল ফেল। তুমি ছাড়া আর কে এত আপনজন আমার রয়েছে!

একবারের জন্যে হলেও সব কথা তোমায় আমার বলতেই হত। তাই এত কথা বললুম।

এরপর আমি তলিয়ে যাব মহাবিস্মৃতির অতলে। আর কোনদিন তোমায় কিছু বলতে আসব না। ওগো, আর কোনওদিনও না। আগের মতই নির্বাক হয়ে যাব, চিরতরে। যতক্ষণ বেঁচে থাকব, আমার কান্নার মৃদুতম আওয়াজও তোমার শান্তির ব্যাঘাত করবে না।

আমি মারা গেলে চিঠি তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে। এই চিঠি এমন এক নারীর অন্তিম জবানবন্দী—পৃথিবীতে যে তোমায় সকলের

চেয়ে বেশি ভালোবেসেছিল, অথচ যাকে তুমি কোনদিন চিনতে পারনি। তোমার ডাকে সাড়া দেবার জন্যে যে জীবনভর প্রতীক্ষা—প্রতীক্ষা—প্রতীক্ষাই শুধু করে গেল, কিন্তু যাকে তুমি কোনদিন ডাকোনি। হয়ত—

হয়ত এই চিঠি পাবার পর আমায় তুমি ডাক দেবে।

কিন্তু না—আমি তো তখন সাড়া দেবনা! কখ্‌খনো সাড়া দেব না। ওগো, জীবনে সেই প্রথম তোমার অবাধ্য হব আমি। ওগো, কি করে সাড়া দেব বলো?—কালঘুম থেকে কী করে শুনবো তোমার ডাক?

কোন স্মারক না, কোন ছবি না—কিছুই তোমার জন্যে রেখে যাব না। কেন যাব? তুমি কী দিয়েছ আমায়? তাই কোনদিন তুমি আমায় চিনতে পারবে না। এই আমার ভাগ্য, আমার বিধিলিপি। এরই অভিশাপ সারা জীবন আমি বয়ে বেড়িয়েছি, মৃত্যুর পরেও এর জের চলবে। মৃত্যুর মুহূর্তেও তোমায় ডাকব না—অজানার মত বিদায় নেব তোমার কাছ থেকে।

মৃত্যুকে আমি সহজভাবেই গ্রহণ করতে পারব, কারণ তুমি তো তখন পাশে থাকবে না। তুমি তো কিছু অনুভব করবে না। তুমি ব্যথা পাবে জানলে কি এ অভাগী মরতেও পারত!

ওগো, আর যে লিখতে পারছিনে! মাথাটা ভারী হয়ে উঠেছে, গা-হাত-পা টনটন করছে, জ্বর-জ্বর বোধ হচ্ছে। শুনছ, এখন আমি একটু শোব। একটু পরেই হয়ত সব শেষ হয়ে যাবে। হয়ত এইবার, জীবনে মাত্র এই একবার, ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হবে। ওরা এসে আমার মাণিককে নিয়ে যাচ্ছে, চোখ মেলে হয়ত আমায় তা দেখতে হবে না।

ওগো, আর যে হাত চলছেনা! বিদায়, প্রিয়তম, বিদায়। তোমাকে অনেক, অনেক, অ-নে-ক ধন্যবাদ। হিসেব-নিকেশ আর করব না, যা ঘটেছে ভালোই হয়েছে। শেষ নিশ্বাসের মুহূর্তটি পর্যন্ত তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

তোমাকে সব বলতে কথা পেরে কী ভালোই যে লাগছে! বুক থেকে একটা দুর্বহ পাষাণের ভার যেন নেমে গেল। এখন, পুরোপুরি না পারলেও এখন তুমি বুঝবে কতখানি ভালো তোমায় আমি বাসতুম। কী গভীরভাবে ভালোবেসেছিলুম। তবু, আমার এই প্রেম কখনো তোমার বোঝা হবে না। কোনদিন তোমার পথের বাধা হইনি— এই আমার সান্ত্বনা। এই সান্ত্বনাই সম্বল। তোমার আনন্দোচ্ছল জীবনের ধারা অব্যাহত থাকবে। আমার মৃত্যুতেও তোমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। ওগো, এই সান্ত্বনা বুকে নিয়েই আমি মরছি। আমি মরছি—

কিন্তু হায়, জন্মদিনে আর কে তোমায় শাদা গোলাপ উপহার পাঠাবে! শূন্য থাকবে তোমার ফুলদানি। হোক বছরে মাত্র একবার, তবু তো আমার জীবন-নির্যাসে, প্রেমের সুরভিতে তোমার ঘরখানি আর কখনো ভরে উঠবে না! ওগো, যাবার আগে তাই একটি প্রার্থনা জানাই—এই আমার প্রথম প্রার্থনা, এবং এই শেষ—আমার মুখ চেয়ে এ মিনতি তুমি রেখ।

প্রতিটি জন্মদিনে, যেদিন মানুষ নিজের কথাই শুধু একান্ত করে ভাবে, তোমার প্রতিটি জন্মদিনে কয়েকটি শাদা গোলাপ এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখ, কেমন? এই ভাবে তোমার জন্মদিনটি পালন করো, বছরে একবার—করবে তো? শাস্ত্রের নির্দেশে লোকে যেমন প্রিয়জনদের মৃত্যুতিথি উদযাপন করে ঠিক—তেমনি করে! আমি আর ভগবান

মানিনে, শাস্ত্রের নির্দেশেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু জানি তোমাকে, তোমাকেই শুধু বিশ্বাস করি। তুমিই আমার ভগবান, তুমিই আমার শাস্ত্র। ওগো, আমার ইহকাল আমার পরকাল সবই তুমি। তুমি ছাড়া আর কাউকেই আমি ভালোবাসিনি। শুধু তোমার মধ্যে দিয়েই আমি বেঁচে থাকতে চাই—বছরে মাত্র একটি দিনের তরে, নিঃশব্দে, সবার অলক্ষ্যে—

ওগো, দয়া করো। ওগো কথা রেখ। দয়া করো প্রিয়তম, দয়া করো! কথা রেখ! কথা রেখ—শেষ মিনতি! কোনদিন তোমার কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইনি, আজ চাইছি…এই আমার প্রথম প্রার্থনা …আর এই শেষ।·· প্রিয়তম, তুমি সুখী হও।…আমি আমি তোমায় ভালোবাসি…আজও তোমায় আমি ভালোবাসি…আজও…এখনও …এখনও…বিদায়—

চিঠিটা শ্রী'র'-র অবশ হাত থেকে খসে পড়ল। তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

একটু-একটু করে আবছায়া স্মৃতির মত প্রতিবেশী এক কিশোরীর মুখখানি মনে পড়ছে, মনে পড়ছে নাচঘরের সেই নারীর কথাও।

কিন্তু সবই আবছা-আবছা, বিস্মৃতির কুয়াশায় ঢাকা। জলস্রোতে ভেসে-যাওয়া নুড়ির মত চঞ্চল, অনির্দিষ্ট, নিরবয়ব। মনের পটে ছায়ার আল্পনা, ছায়া-ছায়া, ছায়ার আনাগোনা। কিছুতেই কায়ারূপ নিচ্ছে না। সুস্পষ্ট ছবি হয়ে ফুটে উঠছেনা। একেকবার স্মৃতির আঘাতে অনুভূতির তারগুলি রণরণিয়ে উঠছে, তবু মনে পড়ছে না।

তাঁর মনে হল—এ স-ব স্বপ্ন। বহুবার দেখে স্বপ্নের মুখখানি তাঁর চেনা-

চেনা মনে হচ্ছে, পরিচিত মনে হচ্ছে স্বপ্নের ঘটনাবলী। এ সবই স্বপ্ন, স্বপ্ন !

রাইটিং টেবিলে সবুজ ফুলদানিটার উপর হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল।

শূন্য !

তাঁর জন্মদিনে আর কখনো তো ওটা এমন নিঃস্ব হয়ে থাকত না।

সমস্ত শরীর তাঁর থরথর করে উঠল। হঠাৎ যেন অদৃশ্য এক দরজার কপাট খুলে গেল—হু হু করে ঘরে এসে ঢুকল অন্য-কোন জগতের হিমশীতল ঝোড়ো হওয়া। নিজে ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসেও সেই হাওয়ার ঝাপটায় তিনি শিউরে উঠলেন।

এই হাওয়া বয়ে এনেছে মৃত্যর পরোয়ানা, আর মৃত্যুহীন এক প্রেমের স্পর্শ। বুকের ভেতরটা তার অসহ্য বেদনায় গুমরে উঠল। হৃদয়ে থেকে কে যেন হাহাকার করতে লাগল। মৃত এক নারীর চিন্তায় তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বসে রইলেন। হৃদয়-মনের গভীর যেন শুনতে লাগলেন সেই নারীর দেহাতীত বাসনাব্যাকুল আর্তি. দূরাগত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত।

স্টিফান জাইগ

প্রিয়তমেষু

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়